রূপ-সুষমা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

পুষ্প-পাত্র কার্য্যালয়
১৪ নং জগন্নাথ দত্ত লেন,
কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা

পরিচয়

আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ মিত্র যখন এই "রূপ-তৃষ্ণা" উপন্যাসখানির ছাপা ফাইল এনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন 'দাদা, আপনাকে আমার এই ছোট উপন্যাসখানির একটা পরিচয় লিখে দিতে হবে,' তখন আমি তাঁর এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। কিন্তু, পরিচয় কার দেব ? উপন্যাসখানির, না তার লেখকের ? অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলাম, উপন্যাসের পরিচয় দিয়ে কাজ নেই—সে পরিচয়, যাঁরা বইখানি কিন্‌বেন, তাঁরাই দেবেন ; এবং সে পরিচয় যে সুন্দর ভাবেই দেবেন, এ কথা আমি উপন্যাসখানি পাঠ করেই বুঝতে পেরেছি। আরও এক কথা, আমার মত সেকেলে মানুষের মতামত এখনকার নব্য মহলে আদৃতও হবে না। তাই, সে চেষ্টা করলাম না।

আমি লেখকেরই পরিচয় দিতে চাই। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু অনেক ছোট গল্প লিখেছেন—বড়, ছোট অনেক সাময়িক পত্রেই তাঁর লেখা বেরিয়েছে এবং আর দশজনের সঙ্গে আমিও সে সকল গল্পের প্রশংসা করেছি, তাঁর লেখার সৌন্দর্য্যের অনেক নিদর্শন পেয়েছি। ছোট গল্প লিখে হাত

পাকিয়ে নিয়ে, তিনি এই উপন্যাসখানি এই প্রথম লিখেছেন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি, প্রথম লেখা উপন্যাস প্রায়ই যেমন একটু কাঁচা রকম হয়, খগেন্দ্রবাবুর এ বইখানিতে তার কোন চিহ্ন নাই—এখানি পাকা হাতের লেখা। আমার এই কথায় যদি কারও সন্দেহ বোধ হয়, তিনি যেন বইখানি পড়ে দেখেন; তা হলেই জানতে পারবেন যে, আমি খগেন্দ্রবাবুকে তাঁর প্রাপ্য প্রশংসাই করেছি—একটুও বাড়িয়ে বলিনি।

শ্রীজলধর সেন

রূপ-তৃষ্ণা

কেমন করে যে মঞ্জীকে আমার আত্মীয় স্বজনের অমতে বিয়ে করে এই দূর প্রবাসে একটা ছোট খাট সংসার পেতেছিলুম—তা কারুর শুনে কাজ নেই। সেটা আমিও আজ অবধি বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। কতদিন আপন মনে বসে বসে ভেবেচি—এ আমি কি কোরলুম? সে সময়ে মঞ্জী কখন কখন আমার কাছে এসে বোলেচে—"কি ভাবচ?" উত্তরে বোলেচি "কিছু না; এমনিই চুপ কোরে বোসে আছি।" সে কিন্তু তা বিশ্বাস করেনি; আরও কাছে সরে এসে আমার হাত দুটো ধরে বোলেচে—"নিশ্চয়ই কিছু ভাবচ। ঐ ত মুখে একটা ব্যথা ফুটে রয়েছে। বোলবে না কি?" কিন্তু কি বোল্‌ব? যা বলবার তা যে বড় সর্ব্বনেশে কথা! এ কথা কি তাকে বলা যায়? আর যে কেউ শোনে শুনুক, তার কাছ হতে এটা গোপন রাখতেই হবে।

তাকে তাই একটা মিথ্যা কথা বোলে ভুলিয়েচি। এমন কথা বোলেচি যাতে তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেচে; একটা গভীর সহানুভূতি দিয়ে সে আমায় ঢেকে ফেলেচে। কিন্তু আমি ত আর পারি না। ঢেকে রাখবারও ত একটা সীমা আছে।

মানুষের বুকের ভেতরে যে ঝড় ঘুরে ফিরে ছুটাছুটি কোরচে বাইরের ঘূর্ণা হাওয়া তার কাছে কিছুই নয়।

মঞ্জীর রূপ নেই। মানুষকে ভুলিয়ে বা বেঁধে রাখবার একটা সেরা অস্ত্রই তার হাতে প্রকৃতি কি জানি কেন দেন নি। সে ভুলাতে বা বাঁধতে পারে না। কিন্তু নিজে ধরা দেয়। এটা আমার মোটেই তৃপ্তিদায়ক নয়। সে কেন ভুলাতে জানে না? শুধু কি ভুলিয়েই সুখ? ভুলবারও ত একটা অপরিসীম আনন্দ আছে। আমি তাকে ভুলাতে পারি কিন্তু তাকে না হয়ে যদি এমন কাউকে ভুলাতে পারতুম যে দুর্দ্দমনীয় তা হলে আমার মন একটা গভীর তৃপ্তিতে ভরে উঠ্তে পারত। কিন্তু তাও যে আমার হবার নয়। এইখানেই আমার মন একটা ঘূর্ণাবর্ত্তে সারা দিন রাত নিরুপায়ে ডুবছে—ভাসছে। আমায় সে ভুলাতে পারে না কেন? তার ভেতর আমার "আমিটা কে" কেন এক নিমিষের জন্যেও হারিয়ে ফেলতে পারি না?

মঞ্জীর রূপ নেই; তাই সবার আপত্তি ছিল আমাদের দুজনের বিয়েতে। কেননা প্রকৃতি আমায় দেহের দিক দিয়ে যে সম্পত্তি দিয়েছিল তাতে সে জিনিষটা আমার ও মঞ্জীর সন্তান-সন্ততিরা ভাগ-বাটোয়ারা কোরে নিলে, তারা শ্রী সৌন্দর্য্যের কাঙাল ছাড়া আর কিছুই হবে না। কিন্তু আমি ভাবতুম আমার মতন ধনীর সঙ্গে আমার মতই ধনী চাই, নইলে সৌন্দর্য্যকে অপমান করা হবে, সৌন্দর্য্যের দেবতা আমার ঘরে অভুক্ত থেকে কেঁদে কেঁদে মরবে।

তাকে বিয়ে কোরে আমি কিছুদিন কোলকাতায় ছিলুম। তখনকার দিনগুলি জলের মতন বেশ নিরবচ্ছিন্ন সুখ মর্ম্মরতানে আমাদের দুটিকে ভরপুর কোরে বয়ে গেল। ভাবলুম আমরাই ত সুখী। কিন্তু বুকের কাছে যে একজন বোসে বোসে দুঃখের বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে, তাকে তখনও চিনি নি।

তাকে বিয়ে করবার আগে আমার মনটা একটা কিসের যেন অজানা ব্যথায় ভরে থাক্‌ত। একটা গভীর অভাব, একটা আকাঙ্ক্ষার বুক ভাঙা করুণ কান্না আমায় ঘিরে থাক্‌ত। নিখিলের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য রাশি আমার মনে যে সুর বাজিয়ে যেত, তার ভেতরে খানিকটা বিষাদ মাখান ভাব দেখতে পেতুম। তাকে আমি যে ভোগ করবার অধিকার পাই নি, তাকে জিতে নেবার সামর্থ্য যে আমার নেই, এইটেই আমার সব চেয়ে প্রাণে বাজ্‌ত।

কত শত যাত্রী বিজয় নিশান উড়িয়ে শ্রীরাণীকে আপন রথে তুলে পৃথিবীর পথ দিয়ে চলে যেত, আমি তাই বসে বসে দেখ্‌তুম আর ভাবতুম—আমি কেন এমন? বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের দরজায় মাণিক নেবার অধিকার আমার নেই কেন? দূর থেকেই এমনি কোরে চেয়ে রব? কিন্তু আকাঙ্ক্ষার কান্নায় ত সৌন্দর্য্যকে জিতে নেওয়া যায় না। শ্রীহীন চিরদিন পথের ধারে অনাহূত থাকবে। তার আহ্বান শুধু ভাঙা বাসরের ঝরা ফুলের শুষ্ক পাপড়ি কুড়িয়ে নেবার জন্যে বেজে বেজে উঠবে। দেখতাম, আজও দেখছি কত উদাসীনের পায়ের তলায় সৌন্দর্য্য

আপনিই অনাহুতের মতন লুটিয়ে পড়চে। সেইটেই কি তার স্বভাব?

এমনি কোরে আমার দিন কেটে যাচ্ছিলো। হঠাৎ ফুটন্ত ফুলের মতন মঞ্জী একদা আমার উদাস জীবনের ভেতর এসে পড়ল। আমি চম্‌কে উঠলুম। তাকে আস্তে আস্তে আঁকড়ে ধরলুম। আমার আত্মীয় স্বজন তাতে বাধা দিলেন।—আমার চোখে তাকে খুব ছোট কোরে দেখাতে লাগলেন। আমি আরও জোরে তাকে চেপে ধরলুম; নিজেকে নিজের কাছে বড় কোরে তাকে তার চেয়েও উচু ঠাঁই দিলুম। সকলের সে বিদ্রূপ—না থাক্।

মঞ্জীর কাছে আমার যে কিছু খুদ-কুঁড়ো এই জীর্ণ মলিন ভিক্ষের ঝুলি বোঝাই ছিল সব ঢেলে দিলুম। সে অবাক হয়ে গেল। আমার এত সৌন্দর্য্য? দুঃখে আমার চোখে জল এল! আমি তখন ভাবতুম এবং আজও ভাবি—আমার অনেক আছে যা কেউ ভাল কোরে ঠাহর কোরে দেখলে না। দেখলে হয়ত ভুলতে পারত না, কিন্তু দৃষ্টিকে মুগ্ধ করবার মত আমার ত কিছুই নেই। যে দৃষ্টি পড়েই সরে যায় তা কতটুকু দেখে?

মঞ্জীকে পেয়ে আমার কান্না থামল কি না বোলতে পারি নে। তবে সেটা আর তখনকার মত শুন্‌তে পেলুম না। মনটা যেন একটা সোয়াস্তিতে ভরে গেল। ভাবলুম, আঃ বাঁচলুম। মঞ্জীর কাছে আমি কত কি মাথা মুণ্ড বোলে যেতুম, সে মন দিয়ে সব শুনত, কি পেত সে তার ভেতর তা বোলতে পারিনে। তবে সে

আমাকে খুব বড় কোরে দেখত; শুধু তাই নয়, সে যেন তাতে গর্ব্ব অনুভব করত। সে বোল্‌ত—"দেখ্‌, তোমায় যে ভালবেসেছে সে আর কাউকে ভালবাসতে পারে না।" আমি হাসতুম; কিন্তু তার ঠিক উল্টো কথা দু একজন বোলত—আমাতে ভালবাসবার কি আছে? আশ্চর্য্য আমার মন। আমি দুটো কথাই সময় বিশেষে মেনে নিতুম। নিজেকে যতখানি ছোট কোরেছি ঠিক আবার ততখানি উঁচু আসনে উঠিয়ে বসিয়েছি। বাইরে থেকে যখন আঘাত পেতুম তখন মঞ্জীকে আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরতুম। মনে হোত জগতে শুধু এইখানটাই আমার আছে, এটুকুকে ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। বুকটা "মঞ্জী" "মঞ্জী" কোরে একটা কান্নায় ভরে যেত। দূরে থাক্‌লে ছুটে গিয়ে তার বুকের ভেতর আশ্রয় নিতুম। পৃথিবীতে কি আর পেলুম, জলের মতন সব বয়ে গেল, শুধু রইলুম আমি আর আমার অনন্ত ক্ষুধার কান্না।

কিন্তু মঞ্জীকে আমি ফঁকি দিইচি। সে তা বুঝতে পেরেচে কি না তা সেই জানে। তবে বাইরে একটা সামান্য দৃষ্টিতেও তা তার মুখে ফুটে ওঠে নি কোন দিন। বিয়ের আগে যখন আমরা বন্ধু বান্ধব পাঁচজন মিলে গল্প কোরতুম তখন আমার মনটা মঞ্জীর দিকে চেয়ে চেয়ে একটা আকুল নিশ্বাস ফেল্‌ত। আমার বন্ধুদের ভেতর সবার স্ত্রীই সুন্দরী; বাইরে পথে ঘাটে অনেক সুন্দরীর ওড়না উড়তে দেখেছি, অনেক চঞ্চল চোখের চকিত চাহনি দেখেচি, অনেক সুঠাম দেহের গতি ভঙ্গিমা বুকের ভেতর অনুভব কোরেচি, অনেক মধুর মুখের

মৃদু হাসি উষার মতন ফুটে উঠেচে। আমি শুধু তা দেখে মর্ম্ম-ভাঙা গভীর নিঃশ্বাস ফেলেচি—হায়রে! মঞ্জীকে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েচে।

বিয়ের কিছুদিন পরে কোথা থেকে ঘুম-ভাঙ্গা দুরন্ত শিশুর মতন মনের সেই কান্নাটা আবার বিপ্লব বাধিয়ে দিল। কোন কারণে আমি মঞ্জীকে তার পিত্রালয়ে পাঠাতে ইচ্ছুক নই; আর আমার আত্মীয় স্বজন সে ত নিজের হাতে সব দূরে ঠেলে দিইচি। তাদের বিদ্রূপ ও মঞ্জীর প্রতি ঘৃণা—কিন্তু সে কথা বলে কি হবে! তবে মঞ্জীকে আমি তার পিত্রালয়ে যেতে কোনদিনও বাধা দিই নি। তবু সে যেত না এই জন্যে যে, আমার সেটা ইচ্ছে নয়। বাপ, মা, ভাই, বোনের জন্যে সে লুকিয়ে কাঁদত কিনা জানি নে, তবে কোনদিন তাদের কোন কথা সে আমার সমুখে বলে নি। সে যে আমায় পেয়ে খুবই সুখী সেইটেই যেন সে মনের ভেতর চেপে রাখতে পারত না।

মঞ্জী আমার কাছে অনেক আব্দার কোরত, আমি তা একদিনও পূরণ কোরতে বিমুখ হইনি। কিন্তু তাকে কোন কিছু দিয়ে আমি বড় তৃপ্তি পেতুম না। তবুও দিতুম, সে যে কত কি তার হিসেব আমার ছিল না। সে তাই পেয়ে ভরপূর হয়ে উঠত। বলত 'তোমার ভালবাসা যে ভোগ কোরতে পায়নি সত্যি সে অভাগী।' উত্তরে শুধু একটা "হুঁ" দিতুম। সে ছাড়ত না বোলত, "বল না তাই কি না?" আবার বোলতুম "হুঁ"—। সে তখন আমার দিকে ঠায় চেয়ে থেকে হেসে ফেলত।

বোলতুম "হাসচ যে!" সে উত্তর না দিয়ে দু হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে তার মাথাটা আমার বুকের ওপর রেখে চোখ বুজে থাকত। আমি আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত কি ভাবতুম। মনে দুঃখ হত মঞ্জীকে আমি ফাঁকি দিচ্ছি। ডাকতুম—মঞ্জী—। সে উত্তর দিত না। আবার ডাকতুম—"মণি—।" সে চোখ মেলে চাইত। "ঘুমোচ্ছ?" সে ঘাড় নেড়ে জানাত—না।

"তবে?"

"এমনিই চুপ্ কোরে শুয়ে আছি।"

"কি ভাব্‌চ?"

"কিছু না—।"

"এমনি চুপ কোরে থাকে?" সে হেসে ফেল্‌ত। আরো নিবিড় কোরে জড়িয়ে ধরে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাক্‌ত।

তাকে আমি সব সময়ে ভালবাস্‌তে পারতুম না। মনটা আমার বেশির ভাগ সময়েই হাহাকার কোরত। আমি যাকে চাই সে যে এই মঞ্জী নয়, তা বুঝতে পারতুম। মঞ্জী আমার দারুণ ক্ষুধা কিছুতেই মিটাতে পারত না। কিন্তু সে তা বুঝত না হয়ত। তার সবটুকু হয়ত সে আমায় ঢেলে দিয়েছিল। হয়ত ভাবত আমি তা খুব আদর কোরে বুকে তুলে নিইচি। মেয়ে জাতটার কি চোখ নেই—না, শুধু সেই অন্ধ? আমি ত জানি ভালবাসার যা কিছু সবই ওদের কাছে ধরা দেয়। তবে সে আমায় ধরে ফেলতে পারে না কেন? আশ্চর্য্য বটে!

একদিন তাকে ডেকে বল্লুম "তোমার মা'র কাছে যাবে?" সে একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে; তারপর একটু ইতস্ততঃ কোরে বোল্লে "না, থাকগে।"

"কেন?"

"কি হবে গিয়ে?" বুঝলুম তার অভিমান; মান ভাঙিয়ে বাপের বাড়ী তাকে পাঠিয়ে দিলুম। সেও হাসি মুখে চলে গেল। যাবার সময়ে বোলে গেল "রোজ একখানা কোরে চিঠি দেবে কিন্তু।"

—যাও ত।"

"সে সব হচ্ছে না অমন কোরলে আমি যাব না।"

দরজায় তখন গাড়ী দাঁড়িয়ে। বল্লুম—"হ্যাঁ—গো—হ্যাঁ—।" সে আমার কাছে সরে এসে আমার পায়ের ধুলো নিতে গলায় আঁচল দিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলো। আমি পাপের ভার আর বাড়াতে অনিচ্ছুক হয়ে, তাকে দুহাতে জড়িয়ে টেনে তুলে মুখে একটা চুমো দিলুম। সে আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে গেল— "আচ্ছা, এর শোধ আমি তুলব; ফিরে আসি আগে।"

সে চলে গেল; আমি একলা। মনটা আমার কেমন ফাঁকা হয়ে ঔদাসীন্যে ভারি হ'য়ে রইল। ভাবলুম দিন কতক বাইরে বেড়িয়ে আসি গে! সে যাবার দুদিন পরেই কোল্‌কাতা ছেড়ে এদেশে সেই যে এসেচি আর ফিরে যাইনি। এইখানেই এই বাড়ীটা খরিদ কোরে সংসার পাতলুম—মঞ্জী তখনও বাপের বাড়ী— আমার শত কাজের ভেতর থেকেও তাকে একখানা কোরে

চিঠি দিতুম, সেও উত্তর দিত। কিন্তু একলা একলা আমার আর থাক্‌তে ভাল লাগল না। মাসখানেক পরে তাকে একখানা চিঠিতে লিখ্‌লুম—"তুমি ফিরে এস। আমার আর দিন চলে না। সারা বুকখানা গুমরে মরছে—মণি, তুমি ফিরে এস।"

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে ঝিলের ধারে অন্যমনস্কের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছি। বেলা যাবারও বড় বেশী দেরী নেই। পথের দুধারে অতি দীর্ঘ "কর্কটী র" সারি—পথের শেষ বাঁকে সেটি শেষ হয়েচে। পথটাও ঝিল ঘুরে এঁকে বেঁকে উঠে পড়ে দূরান্তের গ্রামখানির কুয়াশায় মিলিয়ে গেচে।

দূরে দূরে নীল পাহাড়ের নীরব সারি ধোঁয়ায় ঘেরা ; ঝিলের দূর সীমানায় একটা বহুদূর বিস্তৃত শালবন। আকাশ ঘিরে ঘন নীল মেঘ ; দিগদিগন্তে তার মলিন ছায়া ছড়ান ; ঝিলের বুকে তার নীল মায়া লক্ষ হাঁসের সাদা পাখার শুভ্রতায় স্বপন মাখা। মনটা কেঁদে উঠল। চাই আমার সঙ্গীকে চাই-ই।

স্থির করলুম আজকেই কোলকাতায় রওনা হব। ঝিলের ধারে প্রচুর পরিমাণে সাবাই ঘাস জন্মে রয়েছে। তাদের ভেতর এখানে ওখানে সেখানে কাল কাল বড় বড় পাথর ছড়ান। ইচ্ছে হল তার ওপর গিয়ে বসি। ঠিক সেই সময়েই আমার পিছনে কে যেন খুট খুট কোরে একটু জোরে হেঁটে আস্‌ছিল। ফিরে দেখ্‌লুম। আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্ কোরে উঠ্‌ল। ভাল কো'রে চোখ মেলে চাইতে পারলুম না। যেটুকু দেখ্‌লুম তা যেন অনন্তকালের মতন ; মুছবে না, কিছুতেই এ ছবির আব্‌ছায়

রেখা আমার মন থেকে মুছবে না। আব্ছায়া যা তাই বিদ্যুতের মতন ফুটে উঠ্ল। ভাষা কতটুকু মনের কথা প্রকাশ কোরতে পারে? মানুষের এই একটা দীনতা; মনের ভাব ভাষা খুঁজে খুঁজে এমনি কোরে চিরদিন গুমরে মরে গেল। তখন মঞ্জী কোথায় ছিল;—রাতের তিমিরের মতন সে ঊষার আলোর ঢেউয়ে বিশ্বের বহুদূর কোণে ভেসে গেল। আমার হৃদয়ে লক্ষ পাখী একসঙ্গে কলতান তুল্লে। রক্তের সঙ্গে রূপের নেশা জড়িয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্লুম।

মেঘের আড়ালে আড়ালে সন্ধ্যা এসে নিঃশব্দে চলে গেছে। রাতের কালো ছায়া বিশ্ব ঘিরে ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠ্ছে। ঘন ঘন মেঘ ডাক্তে লাগল। বৃষ্টির ভয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ফিরল্লুম। বাড়ী থেকে অনেকটা এগিয়ে একটা ঘোরা পথে এসে পড়েছিলুম। মাঝে মাঝে বেশ একটা সজল ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগ্ল। হঠাৎ দেখি আমার সাম্নের চৌরাস্তার ঠিক মাঝখানটিতে সেই তরুণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে গিয়ে মনে হল যেন পথ ঠিক করতে পারছেন না। আমি বল্লুম, "কিছু মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?"

তিনি একটু হেসে বল্লেন—"বলুন,—কিন্তু তার আগে আমার বাড়ীর পথটা বলে দিন—।"

"আমারও মনে হচ্ছিল যেন পথ ঠিক কোরতে পারছেন না। কোথায় যাবেন?" তিনি যে ঠিকানা বল্লেন তা আমারই বাড়ীর

পাশে। ইতি মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছে। দুজনে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলুম। তিনি বাড়ীর গেটের ভেতর ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি এল। আমায় একটা ধন্যবাদ দিয়ে তিনি একটু দৌড়ে ঘরে গিয়ে উঠ্‌লেন ;—আমিও এক দৌড়ে আমার বাড়ীর গেট্ পেরিয়ে সোজা ঘরে গিয়ে উঠ্‌লুম।

ঘরে আমি একলাটি আলো জ্বেলে দরজা জানালা বন্ধ কোরে বিছানার ওপর বসে রইলুম। মনটা আরও ভার হয়ে উঠ্‌ল ; পৃথিবীটা আরও ফাঁকা হয়ে গেল ! বাইরের বৃষ্টি ধারারও শেস হল না।

হঠাৎ মনটা একটা শ্লেষোক্তি কোরে বসল—"তোমার ভাল-বাসা কতটুকু হীন ভিত্তির ওপর স্থাপিত। এক নিমেষে সব ভুলে গেলে ?"

মনের ভিতর ভয়, অনুশোচনা ও নিজের ওপর ঘৃণা ঘোরা-ফেরা সুরু কোরে দিলে। তাইত এ আমি কি কোরছি ; "মঞ্জী ! "মঞ্জা !" কিছুতে তাকে ছাড়ব না। আমার জীবনের শেস অবধি তাকে বুকের কাছে রাখ্‌ব। সে আমায় সারা প্রাণ ঢেলে ভালবাসে। আর আমি ?—জানি না সেও আমায় আমার মতন ফাঁকি দিচ্ছে কি না। জানি না বিশ্বের আলোক ধারা বুকে কোরে যে সৌন্দর্য্যের শতদল দিকে দিকে ব্যাকুল আঙুল বাড়িয়ে অনন্ত কাল ধরে ফুটে আছে, তা তাকেও দিনান্তে নিশান্তে ঠিক আমারই মতন একটা গভীর ক্ষুধায় অভিভূত কোরচে কি

না। মানুষের মন যে নিশার আকাশের মতন আলোর ক্ষুধায় ভরা। সে ক্ষুধা যদি তাকে ব্যাকুল না করে, শুধু আমাকে দিয়েই যদি তার সব ক্ষুধা মিটে যায়, তবে বোলব—সে কত ক্ষুদ্র—কত সংকীর্ণ এই রমণী হৃদয়। রূপ যে অনন্তকাল ধরে অরূপের দিকে চেয়ে অবিশ্রান্ত পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে, কোরকের পর কোরককে জাগিয়ে দেয়! গন্ধে গানে সে যে লক্ষ জগৎ গড়ে তুল্‌চে! এই এতটুকু আমিতে তার সব পিয়াসা ঘুচে যাবে? আমি কি; আমাকে দিয়ে তার কি হবে? এ আমি কি কোরলুম; আজ আর যে কোন উপায়ই নেই! পাখীর বন্ধ খাঁচার রুদ্ধ দ্বারটুকু ভেঙে দিলেও আজ সে যে মুক্তির মাঝে তার ডানাছুটো মেলে দিয়ে উড়্‌বে না। বাইরের সুধায় যে আমি বিষ ঢেলে দিয়েচি। কেন আমি মঞ্জাকে বিয়ে কোরলুম! আমার এই এক লহমার জীবনটা কি নিঃসঙ্গ জলধারার মতন আপন গাথাখানি গাইতে গাইতে নিরুদ্দিষ্ট পথে একটা গভীর আশা ও তৃষ্ণা বুকে নিয়ে বয়ে যেতে পারত না!

তখনও বৃষ্টি পড়্‌ছে। আমার দু'চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা তপ্ত জল ঝরে পড়্‌ল।

(২)

পরদিন সকালে আমার বাড়ীর সমুখের ফুলবাগানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। আকাশ সুন্দরীর অশ্রুধৌত নীল আঁখির মতন শান্ত সুন্দর, পৃথিবী তরুণী বিধবার মতন নির্ম্মল গম্ভীর।

বাগানে হাজার হাজার যুঁই, বেল, মালতী, বকুল ফুটে উঠে গন্ধে প্রাণ উতলা কোরে তুলছে। জীবন্ত প্রভাতের নীরব বাঁশীতে নিখিল ছাপিয়ে যাচ্ছে। আমার পাশের বাড়ীতে কোনই সাড়া শব্দ নেই। কালকের সেই তরুণীকে দেখতে পেলুম না।

* * * *

দুপুরের মেঘলা বেলাটা ঘরে বোসে বোসে ভাল লাগ্‌ছিল না। বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।—

পথের পারে একটা মহুয়ার ছোট বন ছায়ায় ভরা। সেই ছায়াটুকু দেখে মনটা কেমন কাঁদতে লাগ্‌ল। কি যেন নেই, কি যেন নেই—কতদূরে কতদূরে এই যেন তার মূল ভাব। বনের ভিতর ঢুকে কিছুদূর গিয়ে দেখি আমার প্রতিবেশিনী চুপ কোরে একটা গাছের তলায় একটা কাল মিস্‌মিসে পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর কালো চুলের রুক্ষ রাশি কপোলে, গলে, পিঠে বিপর্য্যস্ত ভাবে লুটিয়ে বাতাসে খেলা কোরছে। পরণে একখানি লাল পেড়ে সাদা শাড়ী, তার গাঢ় লাল চওড়া পাড়টি সোণার আলোর স্তব্ধ রেখার মতন বুক বেয়ে মাটীতে শুক্‌নো পাতার ওপর নেমে গেছে, পা দুটো যেন কোন্ তরুণের কাঁচা রক্তে রঞ্জিত। এক দৃষ্টে দুটো ঘুঘুর দিকে তিনি চেয়ে আছেন।—আমার রক্ত পুলকে নেচে উঠ্‌ল, বুকের ভেতর একটা অজানা আশঙ্কা কোথা থেকে যেন ভেসে উঠ্‌ল। চুপ কোরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। ঘুঘু দুটো তখন তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে ঠোঁটে পরস্পরের ঠোঁট স্পর্শ কোরচে। হঠাৎ বন দুলিয়ে গভীর উচ্ছ্বাসে একটা

হাল্কা হাওয়া বনের ডালে ডালে মিলিয়ে গেল। ঘুঘু দুটোও যেন হাওয়ার সঙ্কেতে কোন গহন বনে এক নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার প্রতিবেশিনী পিছনে ফিরে তাকিয়ে আমায় দেখে অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুজনেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। তিনি আমায় হাত তুলে নমস্কার কোরলেন, আমি ফিরিয়ে দিয়ে বল্লুম,—

'আমি জানতুম না যে আপনি এখানে আছেন। আপনাকে দেখে ফিরে যাব এম্‌নি—।"

"না, না। আপনি এসে ভালই হল; একলাটি বোসে বোসে কি কোরব ভাব্‌ছিলুম।"

আমি এগিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি বল্লেন "চলুন, আমাদের বাড়ী। কিন্তু আপনার তাতে—।"

"আমিও একলা থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ছিল না বলে বেরিয়ে পড়েছি।

"বেশ মজা। এক কারণ দুজনেরই।

বুকের ভেতরটা আমার তখন গুণ গুণ কোরতে লাগ্‌ল। তিনি বল্লেন—"চলুন তবে।"

আমরা দুজনে পাশাপাশি চল্‌তে লাগলুন। মনে হল এমনি কোরে বিশ্বের আদিতে সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতা পাশাপাশি বেরিয়ে এসেচে বিশ্বের অনন্ত পথে চিরযাত্রায়। তবুও এদের ভেতর একটা চির ব্যবধান বেড়েই চলেছে। কে বলবে কোথায় এদের সমাপ্তি—মিলনে না চির-বিচ্ছেদে?—তিনি চল্‌তে চল্‌তে আমায় বল্লেন—"এ দেশটার সব আপনি দেখেছেন?"

বল্লুম "হ্যাঁ প্রায় সব।"

"ঐ দূরের পাহাড়টায় আমায় একদিন নিয়ে যাবেন ?"

"অত দূরে !"

ব্যাগ্র কণ্ঠে "হ্যাঁ হ্যাঁ অত দূরেই যাব।"

"পথঘাট এত বিশ্রী যে মেয়েদের যাওয়া অসম্ভব।"

"মেয়েদের এমনি কোরে আর কতদিন খোঁড়া কোরে রাখ্‌বেন বলুন ত !" বোলে তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন। সে চোখে যেন একটা সুগভীর আহ্বান মাখান। তারপর আবার কাতর স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা কোরলেন—"নিয়ে যাবেন না ?"

"বেশ চলুন একদিন—!"

"চলুন আবার কি !—"

"তবে !"

"তুমি,—তুমি বোলবেন।"

"কবে যাবে !"

"যেদিন সুবিধে হবে।"

"কাল—!"

"হ্যাঁ, সেই ভাল।" বন পেরিয়ে আমরা পথে এসে পড়লুম। পথ দিয়ে দুটো কোল যাচ্ছিল। তারা হাঁ কোরে আমার প্রতিবেশীনীর মুখের দিকে চাইতে চাইতে চলে গেল। একটু গিয়ে দুজনেই তাদের বাড়ীর গেট পেরিয়ে ঘরের বারান্দায় উঠলুম। সে বল্লে—

"বাইরে বসি—কেমন !"

"সেই ভাল—কিন্তু তোমায় কি বোলে ডাকব !"

"ছবি বোলে—ওহোঃ—দাঁড়ান" বোলে সে সেখান থেকে ঘরের ভেতর উঠে গেল ; আমি একলাটি বোসে বোসে বুকের ভেতরে নব সঞ্চারিত পুলকটা বেশ আনন্দের সঙ্গে অনুভব কোরতে লাগলুম। মন থেকে ভূত ভবিষ্যৎ সেই পাখী দুটোর মত কোথায় যেন উড়ে গেল। শুধু বর্ত্তমানটাই অতি পরিস্ফুট হয়ে আমাকে জড়িয়ে রইল। চারিদিকে একটা ভরাট সুখতান অদ্ভুত মোহন ছন্দে বাজতে লাগল। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছি, ছবি একখানা ফটোর এলবাম হাতে নিয়ে আমায় বোল্লে—"ঝিলের কূলে সেই উঁচু পাথরটা দেখেছেন ত ? তার ওপর দাঁড়িয়ে বনের একটা Side View নিইচি !"

"দেখি, বাঃ চমৎকার !"

"আপনি ফটো তুলতে জানেন !"

"না—।"

"হ্যাঁ জানেন ; দুষ্টুমী কোরছেন।

কি মিষ্টি মেয়েদের মুখে ঐ "দুষ্টুমী" কথাটা।

"না, সত্যিই জানি না—। তুমি শেখাবে ?"

"আমি আবার কি শেখাব ! ছাই জানি।"

এলবামটার ভেতর আরও অনেক ছবি ছিল ; সেগুলো আমি উল্টে উল্টে একে একে দেখতে সুরু কোরে দিলুম ; সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে আমায় সব বুঝিয়ে দিতে লাগল।

এলবামের শেষ ছবিখানা ছবির নিজের। তাতে আর ছবির বর্ত্তমান চেহারাতে কিছু পার্থক্য ছিল। সে সেটাকে কিছুতেই দেখতে দেবে না। হাত দিয়ে ঢেকে রইল। আমার ইচ্ছে হল সেই রাঙা কোমল হাতখানায় অজস্র চুমো ঢেলে দিই। তা যদি না পারি ত ঐ হাতটাকে আমার এই কুৎসিত শুষ্ক হাতখানার ভেতর পূরে বুকের কান্নাটাকে স্পর্শসুখে ঢেকে দিই। কিন্তু একটা দারুণ বাধা আমার ভেতর আঙুল উঁচিয়ে রইল। তবু কাড়াকাড়ি করবার সময়ে তার হাতে আমার এই তর্জ্জণীটা শুধু একটু ছুঁয়ে গেল। মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ যেমন শিউরে ওঠে আমার সারা দেহের রক্তধারাও তেমনি চকিতে নেচে উঠল। শুধু একটী পলেই যে অনন্তকাল ফুটে ওঠে, একটী অণুতেই যে নিখিলের রূপ দেখা যায় এ আমি সেইদিন একটুখানি ছোঁয়াতে বুঝ্‌লুম। আমার নেশা চেপে গেল; আরও চাই। পোষা বাঘকে রক্তের স্বাদ পেতে দিতে নেই, তাহলে সে একটা উদ্দীপ্ত রক্ত পিপাসা নিয়ে ক্ষেপে উঠবে।

সে বল্লে—"রাগ কোরলেন ?"

"কেন ?"

"ছবি দেখ্‌তে দিলুম না বোলে ?"

"ও ছবি আমার চোখের সমুখেই রয়েচে।"

তার মুখখানি গোলাপের মত রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। কথাটার সে কোন জবাব দিলেনা। তার মনের ভাবটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না বটে; কিন্তু নিজের এই ব্যবহারটায় মনে মনে

নিজেই ঈষৎ লজ্জিত হলেও সে ভাবটাকে যেমন আমল দিলুম না। বল্লুম—"চল, বেড়িয়ে আসি।"

"বেড়াব কি? আমার এখনও অনেক কাজ পড়ে আছে।"

"কখন শেষ হবে?

"সন্ধ্যের আগে ত নয়ই, আপনি কিন্তু কাল আসবেন—নিশ্চয়ই।"

আমি একটা অসোয়াস্তি বুকের ভিতর পূরে "আচ্ছা" বোলে পথে বেরিয়ে পড়লুম। বাড়ীতে না গিয়ে হাওয়ায়-ওড়া শিমূল তুলোর মতন নিরুদ্দেশের পথে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে এলুম।

শোবার ঘরের সব জানালাগুলো খুলে ঘরের আলো নিবিয়ে জানালার ওপর ঝুঁকে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আঁধার আকাশে লক্ষ লক্ষ তারার চঞ্চল আলোর হাসিটুকু দিগদিগন্ত স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে রেখেচে। ঝির ঝির কোরে বাতাসে বইচে। ছবিদের বাড়ীর জানালা দিয়ে ঘরের আলো বাইরে প্রাচীর সংলগ্ন একটা লম্বা ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের গুঁড়ির ওপর লেগে আছে। মনে তখন আমার কি হচ্ছিল তা আর বলব না। আমি অনেকক্ষণ একলাটি দাঁড়িয়ে রইলুম, বাইরে থেকে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীর ঝঙ্কার ছাড়া আর কোন প্রাণীর সাড়া পেলুম না। ছবিদের বাড়ীর আলো নিবে গেল; জানালা বন্ধ হল। আমি আস্তে আস্তে আমার ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে কি করব, বসে বসে ভাবতে লাগলুম।

*　*　*　*

পরদিন সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ; ঘরে বসে বসে মনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল। ভাবলুম বৃষ্টি মাথায় কোরে ছবির বাড়ী গিয়ে উঠি। কিন্তু সে তখন কি কোরচে জানিনে, হয় ত গেলে অন্যায় হবে। অথচ তাকে দেখবার জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হ'ল। মেঘে মেঘে যে বেলা হয়েছে এ খেয়াল আমার আদৌ ছিল না। বেরুতে যাব এমন সময় ডাকপিয়ন ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এসে খান চারেক চিঠি দিয়ে গেল। যাহোক একটা ক্ষণেকের আশ্রয় পাওয়া গেল, দেখে একটু যেন সোয়াস্তি পেলাম।

আমার সমুখের জানালাটা খোলা; বৃষ্টির ঝালরের মাঝে ছবির হাসিভরা মুখখানা তাদের জানালার ফাঁকে হঠাৎ ফুটে উঠ্‌ল। সে আমার জানালার দিকে চেয়ে আছে। আমি উল্লসিত হয়ে খুব চেঁচিয়ে তাকে বল্লুম—"কি দেখ্‌চ?" সে বৃষ্টির শব্দে শুন্‌তে পেলে না। কাণের ওপর হাত দিয়ে কি যেন বোল্‌লে। আমিও শুন্‌তে পেলুম না। তবে মুখের ভাবে বুঝতে পারলুম যেন কি জিজ্ঞাসা কোরচে। আমি তাকে হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে ইসারা করে চিঠিগুলো পকেটে পূরে তাদের বাড়ীতে একদৌড়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে হাজির হলুম।

সে বল্লে—"আপনার সব যে ভিজে গেচে।"

"ও কিছু না, গায়ের তাতে শুকিয়ে যাবে? তুমি আমায় কি বোল্‌ছিলে?"

"বোল্‌ছিলুম—কি বোল্‌ছেন?

বল্লুম "জিজ্ঞাসা কোরছিলুম—কি দেখ্‌চ ?"

"কিছু না—আপনার জানালা খোলা দেখে ভাবছিলাম ঘর ভিজে যাচ্ছে অথচ আপনার কোন খেয়ালই নেই।—

উত্তরে আমি যে একটা বে-খেয়ালি পরম ভাবুক সেটা প্রকাশ করলুম শুধু একটু হেসে। সে বল্লে—"বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।" বলে চলে গেল; আমি একটা চেয়ারে বসে চিঠিগুলো একে একে পড়তে লাগলুম। তার ভেতর এক-খানা ছিল মঞ্জীর। চিঠিটা আমার কাছে ধূমকেতুর মতন ঠেক্‌ল। কেমন যেন একটা বিরক্তি মনে এল। চিঠিটা পড়তেই ইচ্ছা করছিল না, তবু পড়লুম; মঞ্জী লিখেচে—

"———

তোমার চিঠি পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। কেন বলত? আমি আর থাক্‌তে পারচি না; এসে আমায় নিয়ে যাও। তোমার জন্যে আমার বড় মন কেমন করে। সত্যি তুমি টের পাও না? আমি কিন্তু টের পাই যে তোমার একলা থাকতে ভাল লাগছে না। আমার কথা একলাটি বসে বসে কত ভাবছ। নিশ্চয়ই এস, নতুন বাড়ীতে যাবার জন্যে আমার খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি না নিয়ে গেলে কি করে যাব বলত? লক্ষীটি শীগ্‌গীর কোরে এস। কেমন আছ জানাতে ভুলো না।

আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম নাও। ইতি

তোমার—"মণি।"

মঞ্জী আসতে চেয়েছে, কিন্তু তাকেই আমি এ দুটো দিন

একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। তার একটা কথাও আমার মনে পড়ে নি। ঠিক করলুম, তাকে একটা ছুতো দেখিয়ে এখন আসতে নিষেধ কোরব। কিন্তু কি ছুতো দেখাই সেই কথাটাই ভাবচি, এমন সময়ে ছবি চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। সেগুলো সে টেবিলের ওপর সাজাতে সাজাতে আমায় বল্লে—"এত ভাবনা কিসের ?"

"ভাবচি না কিছুই।"

"উঁহু—; মুখে একটা উদ্বিগ্ন স্পষ্ট আঁকা রয়েচে।"

আমি একটু হেসে বল্লুম—"তোমরা মেয়েরা মানুষের খুঁৎ ধরতে ভারি মজ্‌বুৎ।"

"তাই কিনা—নিজেরা কিছুই জানেন না যেন—."

কথাটা যে একটু ঘুরে গেল এটা তখন বড় সোয়াস্তি ঢেলে দিলে মনে। হঠাৎ ঘরের ভেতরে ঘড়িতে ঢঙ্ ঢঙ্ কোরে ১১টা বেজে গেল। ১২টায় ডাক চলে যাবে। চিঠিটার উত্তর তখনই দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে। আমি একটু তাড়াতাড়ি চা খেয়ে, বিকেলে আবার আসব বোলে বাড়ী চলে এলুম। বাড়ী এসে মঞ্জীকে লিখলুম—বাড়ীটার মেরামত দরকার। বর্ষায় এ বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব ; অতএব বাড়ী মেরামত সারা হলে তাকে নিয়ে আসব। সে যেন ব্যস্ত না হয়। চিঠিটার যে একটা করুণ উত্তর আস্‌বে, তা আমি অনুমান কোরে নিলুম। কিন্তু তার উত্তরের ভাবনা এখন নয় ; চিঠি এলে তখন দেখা যাবে বোলে, মন থেকে, মঞ্জীকে একেবারে ঝেড়ে ফেল্‌বার বেশ একট চেষ্টা

করলুম। কিন্তু সে গেল না। খালি ছোট একটু সাদা মেঘের মতন মনের একটা নিভৃত কোণ খুঁজে নিয়ে লেগে রইল।

সেদিন সারা দিনরাত ধরে বৃষ্টির আর বিরাম ছিল না। মনটা পাখীর মতন ঘরের বাইরে ছবিকে প্রদক্ষিণ কোরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ সে মাছরাঙার মতন ছপ্ কোরে দূর কোল্‌কাতায় মঞ্জীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে আস্‌তে লাগল। মনে কি জানি কেন একটা আশঙ্কা এল, সে আশঙ্কা ভেদ কোরে মঞ্জীর কালো চোখ দুটো কলঙ্ক রেখার মতন মনের ভেতর ফুটে উঠ্‌ল। মুছে ফেল্‌বার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তা মুছে ফেল্‌তে পার্‌লুম না। মঞ্জীকে আমার ভয় নেই। কিন্তু তার পেছনে কিসের একটা বিরাট ছায়া আছে তাকেই আমার ভয়। সেদিনও একটা গোলমালের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দিলুম।

(৩)

সেই পাহাড়টায় ছবিকে নিয়ে বেড়াতে এসেচি!

সমুখে আমাদের গভীর ও বহুদূর বিস্তৃত সবুজ শালবন, আঁচলের মতন বিছানো। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দুটি একটী পাখী, এগাছে ওগাছে ডেকে ডেকে উঠছে ;—ঝির ঝিরে অমল প্রভাত-বাতাস, পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট প্রতিধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে।

পাথরের ওপর দিয়ে, গাছের পাশে, পাশে বন সরিয়ে ওপারে উঠতে উঠ্‌তে ছবি বল্লে—

"আর উঠ্‌তে পারছি না, হাঁপিয়ে পড়েছি—"

আমি—"তবে এই গাছ তলায় একটু বোস—"

"না আর একটু ওপরে উঠে তবে বোসব—"

বলে সে সম্মুখের বড় পাথরটার ওপর দিয়ে ওপরে উঠে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি একটু তাড়াতাড়ি সেটার ওপর উঠে নিচে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলুম, সে তার উষ্ণ কোমল হাতখানি দিয়ে নিঃসঙ্কোচে সেটাকে চেপে ধরলে। আমি একটু ইচ্ছে করেই তাকে আমার প্রায় একেবারে বুকের কাছে টেনে তুলে নিলুম। তার ক্লান্ত নিঃশ্বাসটুকু আমার মুখের ওপর লাগ্‌ল। সে ওপরে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে পাশেই একটা খুব বড় পলাশ তলায় গিয়ে বসে পড়ল। আমি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। যে হাতখানিকে সেদিন অমন করে চেয়ে ছিলুম, সেখানি আজ এমন কোরে আমার পানে এগিয়ে এল ?

একটু পরে সে বল্লে—"বসুন—"

"না দাড়িয়েই বেশ আছি—তোমার খুব কষ্ট হয়েছে না ?"

"না শুধু একটু হাঁপিয়ে পড়েছি ; এখন সেরে গেছে——"

আমি আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে বসলুম। সে খুব মৃদু সুরে ভরা ক্ষেত যেমন কোরে গুঞ্জরণে তার তীর ভরিয়ে দেয়, তেমনি সুরে গান গাইতে লাগল। সে গানের একটি কথা বা তার সুর ভাঙ্গিমার একটুখানি কিছুই মনে লাগ্‌ল না ; মনের ওপর ফুটে উঠ্‌ল শুধু সমগ্র প্রকৃতির সুরের জালে জড়ানো শান্ত শ্যামল রূপ !

তা ছাড়িয়ে, ওপরে নিঃসীম নীল মৌন আকাশের আলোক পথ বেয়ে বেয়ে মন যেন সে কোথায় যার খবর সে জানে না, তার পানে একলাটি চলে চলে যেতে লাগ্‌ল।

মনে হ'ল আমার চারিপাশের যারা তারা সবাই আমারই সাথে এমনি ব্যাকুল হয়ে দলে দলে যাত্রা করেছে। রৌদ্র ঢালা এই নদী গিরি বনের নিরালা উপকণ্ঠে বসে আজকে যেন শুন্‌তে পেলুম—অন্তর তলের ভাষাখানি।...

"ঐ দেখুন কারা আস্‌ছে—"কথাটায় হঠাৎ যেন স্বপ্নটা টুটে গেল। একটু চমকে উঠে নিচের দিকে চেয়ে দেখলুম—দুজন বাঙালী যেন আমাদের দিকেই উঠে আস্‌ছে।

বল্লুম—" যে আসে আসুক ; তুমি থাম্‌লে কেন ?"

"ভারি ত একটা পচা গান—"

"তোমার অনাদরের যেটা সেটাই যদি আমার কাছে এতখানি মিষ্টি হয় তবে ভালটা আমায় না জানি কোন্ রাজ্যে নিয়ে যাবে—"

ততক্ষণে তারা দুজনে ওপরে উঠে এসেছে। মনে হ'ল যেন আমারই একজন পুরাণ বন্ধুকে আমার সম্মুখে দেখছি। সেও উঠ্‌তে উঠ্‌তে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সোজা আমাদের কাছে এসে বল্লে—

"বাঃ—তুই ?" ছবি একটু যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। আমার একজন সহপাঠির সঙ্গে এত বছর পরে দেখা, আবার এদিকে পাশে নিঃসম্পর্কীয়া ছবি ! সে আবার বলে উঠ্‌ল—

—"আর বিয়ে করলি খবরও দিলি না?" তারপর ছবির দিকে ফিরে "তোমার স্বামীর আক্কেল দেখ্‌লে বৌদি?" ছবির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠ্‌ল; আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম—

"ইন্দু, উনি আমার স্ত্রী ন'ন।"

হঠাৎ সে এতদূর অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল যে আর দ্বিরুক্তি না কোরে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। তার সঙ্গীটি সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও মাথা নীচু কোরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে ইন্দু যে দিকে গেছে সেইদিকে চলে গেলেন।

ছবি বল্লে—"চলুন এইবার বাড়ী ফিরি।"

দুজনে পাহাড় থেকে যে পথটি পাহাড়টাকে রঙিণ উত্তরীয়ের মতন বেষ্টন কোরে নিচে মাঠের পানে নেমে গেছে, তাই ধরে নামতে নামতে নিচে পৌঁছলুম।

রৌদ্রের তেজ তখন বেড়ে উঠেছে। রৌদ্রের ঝাঁঝে স্পষ্ট মনে হ'ল ছবির খুব কষ্ট হচ্ছে, মুখখানিও শুষ্ক। জিজ্ঞাসা করলুম—

"তোমার বুঝি তেষ্টা পেয়েছে?

"পেলেই বা কি করব?"

"আচ্ছা, তুমি তাহ'লে এই গাছতলায় দাঁড়াও আমি আস্‌ছি—"

"না, আমি একলাটি দাঁড়াতে পারব না—"

"ঐ যে বাড়ীগুলো ঐখান থেকে জল আন্‌ছি—"

"আমি জল খাব না—"

"কেন আমার কষ্ট হবে?"

"কষ্ট দিতে ত বাকী রাখি নি—"

"আচ্ছা তুমি দাঁড়াও" বলে পথের পাশে একটা শালতলার ছায়ায় তাকে দাঁড় করিয়ে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে কোলদের বাড়ীতে একটা লোকের কাছে জল চাইলুম। সে কূয়া থেকে তুলে একটী মাজা ঝকঝকে লোটায় এক লোটা জল দিলে। আমি তাকে আমার সঙ্গে আস্‌তে বলে ছবির কাছে এলুম।

ছবি বল্লে—"আপনি খান্ নি ?"

"—তুমি নাও ত—"

"না সে হবে না, আগে আপনি" বোলে আমার হাত থেকে জল ভরা ঘটিটা কেড়ে নিয়ে বল্লে—"নিন্, হাত পাতুন—"

আমার জল পান শেষ হলে, বল্লুম—

"এবার তুমি। কিন্তু নতুন কোরে জল আন্‌তে হবে যে—"

"কেন ?

"ওটা যে এঁটো জল—"

"আহা হা—" বলে সে সেই জল নিয়ে মুখে চোখে দিয়ে প্রায় সবটুকু পান করে কোলটাকে বল্লে—"এই নাও—।" এই পরম উপকারের প্রতিদান স্বরূপ লোকটাকে গোটাকয়েক পয়সা দিতে গেলে সে প্রত্যাখ্যান করে ঘটিটা হাতে করে চলে গেল।

দুজনে আবার সেই রৌদ্রের ভিতর দিয়ে, জনহীন বাঁকা পথে চল্‌তে লাগলুম, ছবির মুখে রোদ লাগ্‌ছে দেখে মহুয়া গাছের পাতাওয়ালা একটী নত ডাল ভেঙ্গে বল্লুম—"এইটে ধর মাথার ওপর—"

"কেন ?"

"মুখে রোদ লাগবে না—"

সে সেটা হাতে নিয়ে মাথার ওপর ধরে চল্‌তে চল্‌তে বল্লে—

"উনি কে ?"

"কৈ ?"

"সেই যে পাহাড়ের ওপর দেখা হ'ল ?"

"আমার একজন বন্ধু—"

তখনকার সেই ঘটনাটির কথা এতক্ষণ আমার মনে মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছবির মনের ওপর যে তার কোন দাগ পড়ে ছিল তা আমি ভাল কোরে ঠাহর কোরতে পারি নি। যে কথাটা ইন্দু না জেনে বলে ফেলেছিল, সেটা যদি আমার জীবনের মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে উঠ্‌তে পারত! সত্যই যদি সে আমার জীবনের ম্লান দিনগুলির সবটুকু আলো কোরে দাঁড়াত!

হঠাৎ ছবি আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"রোদ্দুরে যে আপ্‌নার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে, এইটে আপনি নিন্—"

"তোমারই থাক্—"

"তবে আমিও একটা এনে নিচ্ছি—" বলে একটা ছোট পলাশ-গাছের ডাল পথের পাশের একটা গাছ থেকে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—

"নিন্—" এবং কথাটার সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে মোটরের হরণের শব্দ হল। আমরা ফিরে দাঁড়ালুম, দেখলুম একখানা লরি

আস্‌ছে। হাতছানি দিয়ে সেটাকে থাম্‌তে বল্লুম। লরিখানা আমাদের একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল।

দুজনে তাইতে উঠে বাড়ী ফিরে এলুম।

(৪)

সারাদিনের ভিতর সেদিন আর ছবির দেখা পেলুম না। বোধ হয় পথশ্রমে, ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে বিকেলের দিকে একলাই একটু বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম। একটু যেতে না যেতেই দেখলুম একখানা বড় লাঠি হাতে নিয়ে, ইন্দু একলাটি খুব তাড়াতাড়ি আমার বাড়ীর দিকেই আস্‌ছে। আমায় দেখেই বল্লে—"দাঁড়াও, আগে আমার দোষের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিই—"

"আমার কাছে ত কোন দোষ কর নি—"

"তবে যাঁর কাছে কোরেছি তাঁর দেখা কি পাই না? দোষটা করে হয়ত তোমায় খুবই খুসী কোরেছি? উনি তোমার কে?"

"কেউ নয়, প্রতিবেশিনী আলাপী; ঐ বাড়ীটায় থাকেন—"

"যাক্—তোমায় তাহলে আনন্দ দিতে পেরেছি বল?" আমি চুপ কোরে রইলুম। সে বল্লে—"৮ বৎসর পরে এই দূর দেশে একটী তরুণীকে পাশে নিয়ে জনহীন পাহাড়ে বসে থাক্‌তে দেখে মনে হয়েছিল—উনি তোমার স্ত্রী। তখন আমার চেয়েও বুদ্ধিমান যে কেউ তোমাদের দুটিকে দেখ্‌লে বল্‌তে পারত যে তোমরা নিঃসম্পর্কীয় নও।"

"কিন্তু আমরা নিতান্ত পর—"

"হবে। তবে পরকে আপন করে নেওয়াটাও খুব কঠিন নয়। অমন চেহারা বড় একটা আমার চোখে পড়ে নি। দেরি কোরো না—বিয়েটা করে ফেল—"

ইন্দুর স্বভাব এই ছিল যে সে খুব সোজা ও সত্যি কথা বল্‌ত ; যে কথাটা তার মনে সত্যি বলে লাগ্‌ত সেটাকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারত না। তাই লোকে তাকে ভয় ও সম্মান করত।

আমি বল্লুম "বিয়ে করব তা তোমায় কে বল্‌লে ?"

"তবে সুন্দর মেয়ের সঙ্গে আলাপ কোরো না ; শেষকালে কালো বউ পছন্দ হবে না। মনে হবে সুন্দরী হলেই বোধ হয় সুখী হতে পারতে—"

"তাই কি ?" হঠাৎ মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল।—"আমিও ত তাই ভাবি।" কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য বল্লুম—

"তুই আজকাল কি কোরছিস্ বলত ?"

"সবাই যা করে পড়া শুনা, ছেড়ে আমিও তাই কোরছি—অর্থাৎ চাকরী। আর তুই ?"

"কিছুই না—"

"হুঁ—গোলামী করিস্ না। বসে বসেই পেট চলে—"

"তুই বিয়ে থা কোরিস্ নি ?"

"তোর কি মনে হয় ?"

"কি জানি—বল্ না—"

"কোরি নি—মানে হয় নি—"

"এখানে কোথায় এসেছিস্—ক'দিন থাক্‌বি ?"

"এসেছি ডাক বাংলোয়, থাক্‌ব কত দিন তা জানিনে—যাই হোক্ যে ক'দিন থাকি একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। তা নইলে রোজ রোজ একটা কোরে লোক ধোরে নিয়ে বেড়াতে হত—যেমন তখন কোরেছিলুম, বাংলোয় আমারই মতন সেই ভদ্র-লোকটিকে নিয়ে—"

ঠিক সেই সময় ছবি তাদের বারাণ্ডায় বেরিয়ে এল। ইন্দু বল্লে—"সেই যে তিনি—"

ইচ্ছে না থাকলেও বল্লুম "আলাপ কোরবি ?"

"মতটা জিজ্ঞেস্ না কোরে জোর করে নিয়েই চল না—"

"চল্—" বোলে অগত্যা তাকে সঙ্গে নিয়ে ছবিদের বাড়ী গেলুম। ছবির সঙ্গে ইন্দুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লুম—

"কারুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার অধিকার ত আমার নেই—"

ছবি নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্দু অতি বিনয়ের সঙ্গে ছবিকে বল্লে—"দেখুন, আমার সেই তখনকার দোষটা—সত্যিই না জেনে—"

"না—সে—" বলে ছবি একটু হেসে মুখটা নীচু করলে। এতক্ষণ আমরা তিন জনেই দাঁড়িয়েছিলুম। ছবি হঠাৎ মুখ তুলে আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে দুটি হাত দিয়ে বল্লে—

"বসুন—বা রে—দাঁড়িয়ে রইলেন যে—"

দুজনেই বিনা আপত্তিতে বসে পড়লুম। ছবি দাঁড়িয়েই রইল। ইন্দু বল্লে—"আর আপনি?"

"বোস্‌ছি"—বলে চেয়ারটাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে ছবি বসে পড়ল তাতে।

মনে মনে ভাব্‌তে লাগলুম, ইন্দুকে বলি যে ক'দিন এদেশে থাকে আমার বাড়ীতেই থাক; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলুম, তাহলে ছবির সঙ্গে মিশবার একটা বাধা হবে। কি কোরি? এমন সময় হঠাৎ ইন্দু আমার দিকে ঝুঁকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—

"কি নাম বল্ ত—"

"ছবি—" উত্তরটা একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল

"কি বল্‌ছেন—?"

"কিছুই না—"

ইন্দু আর আমি দুজনেই একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। ইন্দু তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—

"আচ্ছা, আপনি একলা কি কোরে এ বাড়ীতে থাকেন?"

"ক'দিনই বা একলা আছি? বাড়ীতে চাকররা সব আমাদের পুরোণ, তা ছাড়া উনি ত ঐ পাশেই থাকেন—"

সেই কথা শোনার ঝোঁকে ইন্দুকে দেখিয়ে হঠাৎ বলে ফেল্লুম "আর ইনিও আজ থেকে থাক্‌বেন—"

ইন্দু বল্লে—"তোমার সঙ্গে তো আমার এমন কোনো কথা হয় নি—"

কথাটা বলে খুবই ঠকে গেলুম ; কিন্তু আর ঘোরাণ চলে না। বল্লুম—"না হতে পারে ; এখন ত হ'ল—"

সে একটু ভেবে বল্লে—"আচ্ছা।"

হঠাৎ ছবিতে আর আমাতে চোখোচোখি হয়ে গেল। তার মুখখানিতে কেমন যেন একটু সরম ফুটে উঠ্‌ল। মনে হ'ল যেন ইন্দু সেটুকু লক্ষ্য কোরলে। সে বল্লে—"তবে দেরি কোরে কি হবে? চল এই বেলা যাই—"

আমরা উঠবার জন্য প্রস্তুত হতেই ছবি বল্লে—"আর একটু বসবেন না—?"

ইন্দু—"রাত হয়ে যাবে না ফিরতে? কাল যতক্ষণ ইচ্ছে বল্‌বেন বস্‌ব, এমন কি না বল্লেও থাক্‌ব, শেষকালে হয়ত তাড়িয়ে দিতে হবে—" বলে সে ছবির মুখের দিকে চাইলে। ছবিও যেন কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল।

আমরা আর একটু অপেক্ষা কোরে সেখান থেকে উঠে এলুম ; ছবি গেট অবধি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে ফিরে গেল।

সেদিন যখন ইন্দুর জিনিসপত্র নিয়ে দুজনে ফিরে এলুম তখন রাত হয়ে গেছে। কাজেই আর ছবির সঙ্গে দেখা হ'ল না। তার ঘরের বন্ধ জানালার ফাঁকে একটুও আলোক রেখার সন্ধান পেলুম না। মনটা যেন কেমন কোরতে লাগল! বিশেষ কোরে সেইদিনকার প্রভাত যে-কিছু আমার মনের দরজায় আলো-হাওয়ায়, সুরে-গানে রেখে দিয়ে চলে গেছে সেগুলিকে জীবনের পরম সম্পদ বলে জড়িয়ে ধরে মনটা ব্যথিয়ে উঠতে লাগ্‌ল!

এমন অদিনে কেন এল এত সব? মনের মাঝে এতকাল আধেক যা ছিল, তা আজ সোণার কাঠির ছোঁয়াচ লেগে ফুটে উঠল সত্যি, কিন্তু কোথায় বা তার সার্থকতা? এই দেহটার ভেতর দিয়ে রক্তের তালে যে শিহরণ বয়ে গেল, তার চঞ্চলতা এখনও যে থামেনি!

সে রাতের আকাশভরা তারাদলের আলোক আঙুলের স্পর্শে যেন ছবির জন্যে মনটা আরও ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

(৫)

বটের ছায়ায়—।

সমুখে উঁচু নীচু ভাঙা ভাঙা বিশাল মাঠ। তার মাঝে মাঝে আসনের মতন বিছান ধানের ক্ষেত। সকালে ইন্দু আর আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। বেলা প্রায় ১০টা তখনও আমরা বাড়ী ফিরি নি। দুজনে বসে গল্প কোরছি।

ইন্দু বল্লে—"রোমান্সটা আমাদের জীবনের ভেতর আন্‌তে গেলে হয় অন্য সমাজে যেতে হবে আর না হয় ত পরকীয়া।"

বল্লুম—"আমাদের দেশে বা সমাজে কি রোমান্সের অভাব আছে?"

"আছে বৈকি। যাঁদের নিয়ে রোমান্স তাঁরা বড় একটা যেখানে সেখানে দেখাও দেন না, আর যদি দেন ত এমন অবস্থায় যে, মনের যত কিছু সেন্টিমেণ্ট সব, আপনা হতেই সরে পড়ে। প্রাচীনকালে রোমান্সটা যে কতদূর অবধি গড়িয়ে

ছিল, তার হিসেব দিয়েছেন—মহাকবি কালিদাস। তিনি একে-বারে সেটাকে আশ্রম তরুতলে, মালিনীর কূলে নিয়ে ফেলেছেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে রোমান্সের আগ্রহ আমরা পুরুষরাই এক তরফা দেখাই—"

"যথা—"

"যথা, অমুককে অমুক জায়গায় আমি দেখে পাগল হলুম বটে, কিন্তু তিনি দেখ্‌লেনও না, এমন কি রোমান্সের নামটা অবধি তাঁর কাছে—'ওমা ছিঃ' হয়ে থাকল—"

আমি হেসে ফেললুম। বল্লুম—"তুই রোমান্সের অভাবে বুঝি বিয়ে কোরিস নি ?"

"তা যা ব'ল। আমি কেন সবাই মনে মনে একটা রোমান্টিক কিছু চায়। তবে সংস্কারের পাথর ঠেলে উঠতে পারে না। তরুণের মন চায় বিয়েটা হোক্‌ বা না হোক্‌, একটু রোমান্স হোক—আর সেটা স্বাভাবিক—। তবে একটা কথা, আমাদের দেশে নারীজাতিকে পর্দ্দার বাইরে দেখলে রোমান্সের শিহরণটা যত শীঘ্র দেখা দেয়, যে দেশের নারী পর্দ্দার বাইরে থাকেন সে দেশে কিন্তু সেটা তত সহজ নয় বলেই মনে হয়। তবে আমরা এই হতভাগ্য দেশবাসীরা, আরব সমুদ্রের পারে পশ্চিমমুখো যেখানেই চলিনা কেন, সেখানে পা দিয়ে চির-অভুক্ত প্রাণটা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের রোমান্স আর একটু অন্য ধরণের, সেইজন্যই যেটা রোমান্স আদৌ নয়, সেটাকে তাই করবার জন্যে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।"

একটু থেমে সে আবার বল্লে—"তবে বর্ত্তমানে তুমি যে রোমাণ্টিক একটা কিছু করেছ এতে হিংসে হয়।"

বেলা ক্রমেই বেড়ে চ'লেছে দেখে বল্লুম "তা—চল এবার ওঠা যাক্—"

"চল—" বোলে সে উঠে পড়ল। দুজনে কিছুদূর চলে আসবার পর দেখলুম—দুটি সাহেববেশী বাঙ্গালী আসছেন। তাঁরা কাছে আস্‌তেই ইন্দু হাত তুলে নমস্কার কোরে বল্লে—

"বিজয় বাবু যে—?"

তিনি নমস্কারটি ফিরিয়ে দিয়ে স্মিত মুখে উত্তর কোরলেন—"আপনি কোথায়?"

"এই কাছেই" বোলে ইন্দু আমার বাড়ীটা সেখান থেকে হাতদিয়ে দেখিয়ে দিলে।

ভদ্রলোকটি বল্লেন—"আমিও ত ঐ পাশের বাড়ীটায়—তাহলে আপনারা আমাদের 'নেবার'—" বলে আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

তিনি তাঁর সঙ্গের ভদ্রলোকটীকে দেখিয়ে বল্লেন "ইনিই হচ্ছেন আমার 'হোস্ট'—"

ইন্দু আমায় দেখিয়ে বল্লে—"আর ইনিও আমার 'হোষ্ট'—"

আমরা চারজনে একসঙ্গে হেসে উঠলুম।

বিজয়বাবু বল্লেন—"তাহলে ভালই হ'ল—কি বলহে সুনীল—?"

"নিশ্চয়ই—আপনারা আসচেন ত আমাদের বাড়ী ?"

বল্লুম "তা যখন পাশে আছেন, তখন ত কেউ কাউকে বাদ দিতে পারি নে—"

"অফ্ কোরস্—" বোলে তাঁরা আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। আমরা দুজনে একটু ইচ্ছে করেই আস্তে চলতে লাগলুম। ইন্দু বল্লে—

"ওঁরা তাহলে আজই এলেন, সুনীলবাবুই বোধ হয় ছবির দাদা—"

সুনীল বাবুর চেহারাটার কোনখানে যে এতটুকু গঠন পারিপাট্য আছে, তা আমার চোখে ঠেকল না। নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে তাহার দেহটি যেন প্রকৃতির হাতে গঠিত হয়েছে। বল্লুম "কিন্তু ভাই বোনে চেহারার এত অমিল কেন ?"

"হয়ত আপন ভাই নয়—"

"হবে—"

দুজনে ছবিদের বাড়ীর সমুখ দিয়ে তখন চলেছি। ছবি বাইরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছিল। আমায় দেখে একটু হেসে হাত ছানিতে ডাক্‌লে ; ইন্দু বল্লে—"আমি চল্লুম—তুমি যেন আবার জমে যেও না—"

"না—" বোলে আমি ছবির কাছে যেতেই সে বল্লে—"দাদা এসেছেন—"

"সুনীলবাবু তো তোমার দাদা ?"

সে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে—"হ্যাঁ ; কিন্তু কি করে আপনি জানলেন ?

"হিন্দুর ছেলে মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানা আছে। আর উনি কে?"

"দাদার বন্ধু—"

"তাহলে এবার থেকে আর আমায় দরকার নেই—"

"আচ্ছা হয়েছে—দাদার সঙ্গে আলাপ হ'ল? আমার দাদাটি কেমন সুন্দর দেখলেন?

"দেখলুম বৈকি" এমন সময় ভিতরে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। ছবি একটু ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—চল্লুম। আস্‌তে ভুলবেন না যেন কাল।"

"হাঁ" বোলে আমিও চলে এলুম।

(৬)

প্রায় পনেরোটা দিন চলে গেল।

এর মাঝে শুধু ধোরতে চাওয়া, ধরাদেবার একটা আনন্দই মনকে ভরিয়ে রাখলে। মনে হ'ল কতকাল যেন এই ক্ষুধার্ত্ত হৃদয়খানি একলাটি এমনি একটী ছবির আশায় পথের পাশে বোসেছিল; আজ তার হঠাৎ দেখা পেল। ঐ দেখাটুকুতেই, তা যেন কানায় কানায় বর্ষার নদীর মতন ভরে উঠেছে। ঔচিত্য বা অনৌচিত্য কোথায় তার টানে ভেসে চলে গেল!

মঞ্জী আমার কাছে একটা কর্ত্তব্যের, একটা শাসনের বোঝা মত ঠেক্‌তে লাগল। তার চিন্তায় বা স্মৃতিতে এতটুকুও রস পেলাম না। কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে ত রস নেই; তা যে নীরস ও শুষ্ক। তাই আজ যাতে আমি ভরাট সেটাকে আমার কাছ থেকে—ঔচিত্যের কোন্ বিধান কেড়ে নেবে? আজও মানুষ নীতির নিয়ম

মানতে পারে নি বোলে তার কঠোর শাসন দণ্ডটা তার মাথার ওপর উঁচিয়ে আছে। তাই নিয়ে পুঁথির পর পুঁথিই রচনা হচ্ছে, এবং যতকাল পৃথিবীতে মানুষ রইবে, ততকালই তা রচিত হবে। কেন আমি যাকে ইচ্ছা তাকে ভাল বাসতে পারবো না?

সেদিন সকালে আমি একলাটি বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটু বেলা হয়ে গেছে; ছবিদের বাড়ীর সামনে আসতেই সুনীলবাবু আমায় একটু ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে শুনলুম যে তাঁদের বাড়ীর পৈঠাগুলি পিছল ছিল, তার ওপর দিয়ে নামতে নামতে ইন্দু পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সিঁড়ির নীচে একটা পাথরে তার মাথাটা জোর আঘাত পেয়েছে। একটু ব্যস্ত হয়েই, তাঁর সঙ্গে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখলুম—ইন্দু বিছানায় শুয়ে, ছবি মাথার কাছে বোসে তার মাথায় জল পটি দিচ্ছে আর হাওয়া কোরছে। বিজয়বাবু ডাক্তারের সন্ধানে গেছেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ছবি একবারও মুখ তুললে না, একমনে মাথার জলপটিটা ভিজিয়ে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

বল্লুম—"পাখাটা আমার হাতে দাও—"

ছবি উত্তর কোরলে "না; আমিই পারবো—"

"তোমার কষ্ট হচ্ছে—"

"কিচ্ছুনা; আপনি ঐখান থেকে আর একটু জল দিন—" আমি জল এনে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ইন্দুর দীর্ঘ দেহ ও প্রিয়দর্শন মুখখানায় কেমন একটা যেন অসাড়তা লেগে আছে; ছবি তার

দিকে উৎকণ্ঠা, নারী হৃদয়ের সমস্ত করুণা ও সহানুভূতি নিয়ে ব্যাকুল চোখে চেয়ে বসে একমনে সেবা কোরছে। এমন সময় ডাক্তার এসে দেখে বল্লেন—

"আঘাতটা একটু বেশীই হয়েছে তবে ভয় নেই। এই ভাবেই কিছুক্ষণ থাক্‌বেন—"

তারপর তিনি ঔষধের ব্যবস্থা কোরে চলে গেলেন।

বেলা অনেক হ'ল; সকলের বহু অনুরোধেও ছবি কিছুতেই সেখানথেকে উঠ্‌ল না। প্রায় শেষ বেলায় যখন ইন্দুর চেতনা ফিরে এল, তখন তার মুখের ওপর যেন সেই সঙ্গে একটু তৃপ্তি ও হাসি ফুটে উঠ্‌ল। ইন্দুকে সে কিছুতেই অনেকরাত অবধি সেখান থেকে উঠ্‌তে দিলে না।

শেষকালে অনেক রাত্রে ইন্দু আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরে এল। সেইদিন থেকে কেমন একটা যেন পরিবর্ত্তন, তাদের ভেতর ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সেইদিন হ'তেই যেন তার সঙ্গে ছবির কেমন একটা প্রচ্ছন্ন টান দেখা গেল; কিন্তু বাইরে তাকে অতি সহজে কিছুতেই বোঝা গেল না।

এ ঘটনার দিনদুই পরে দুপুরে ইন্দু পাশের ঘরে বোসে, কি একটা বই পড়তে পড়তে হঠাৎ উঠে এসে বল্লে—

"নিখিল, এবার যাই ভাই—"

"এই পনেরো দিনের ভেতর আজ নিয়ে তোমার যাবার কথাটা পাঁচ দিন বল্লে—"

"পাঁচ দিনও বল্‌তে হ'ত না যদি না তুমি আটকাতে—"

"আমি তোমাকে আটকিয়েছি কেন জানো ?"

"জানি—আমায় যেতে দেবে না বোলে—"

তারপর বল্লে "না রে—সত্যিই এবার আমার যাবার বড় দরকার হয়ে পড়েছে ! যায়গাটা আমায়—"

"থাক্‌তে দিচ্ছে না—?"

"হাঁ—আমি কালই চলে যাব।" দেখলুম তার মুখের ওপর সত্যই একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ছায়া ফুটে উঠেছে। তাকে আমিও আর আটকাব না, সে যাক্‌।

অন্যমনস্কের মত ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে খোলা জানালা দিয়ে ছবিদের বাড়ীর দিকে একটু চেয়ে দেখে আমায় কি যেন বল্‌তে গিয়ে সে থেমে গেল। আমিও কি খেয়ালের বশে ঘরের কোণে উঠে গিয়ে ছোট টিপয়টার ওপরের ধূলি ভরা নীল ঢাকনা খানিকে হাতে নিয়ে তার ধূলা ঝেড়ে আবার তেম্‌নি কোরে পেতে রাখলুম। ঢাকনাখানির ওপরে ছোট ছোট গোটা কতক রেশমের সাদা ফুল তুলে মঞ্জী সেটাকে তৈরি কোরেছিল। টিপয়টার পাশে মাটিতে ধূলোর ওপর মঞ্জীর চিঠির খামখানি এতকাল পড়েছিল। সেটিকে হাতে তুলে নিয়ে একটু উল্‌টে পাল্‌টে দেখলুম।

খুব ধীরে ধীরে মনের দরজায় এগিয়ে এল অতি সঙ্কোচের সঙ্গে কথা কয়টি—"আমি কিন্তু টের পাই, তোমার একলা থাকতে ভাল লাগছে না।"

সত্যি—যে একজনকে ফাঁকি দিতে পেরেছে, আর সকলকে

ফাঁকি দিতে তার এতটুকু কুণ্ঠা বোধহয় না। মানুষের এই একটা দুর্ব্বলতা। সে ভাবছে বসে বসে "না জানি তার কত কষ্ট হচ্ছে" আর আমি ভাবছি এই ছবির সঙ্গে তার তুলনা করে—"মঞ্জীর এত অভাব!"

আর ছবি? তাকেও আমি ফাঁকি দিলাম!

তখনও আমার হাতে খামখানি রয়েছে; ইন্দু বল্লে—"ঐ খামখানি তোমায় এত ভাবিয়ে দিয়েছে?"...আমি যে ভাবছি সেটা আমার মনে ছিল না। খামখানিকে তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে কুটি কুটি কোরে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই না তার টুকরোগুলি হাওয়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময় চাকরটা এসে খানচারেক চিঠি দিয়ে গেল। তার ভেতর তিনখানা ছিল ইন্দুর; একখানি আমার। চিঠিখানিকে হাতে কোরে নিয়ে বাইরে চলে এলুম। সেখানি মঞ্জীর! খুলে পড়তে আমার মন কিছুতেই চাইছিল না। মনে হচ্ছিল যেন আমার এতদিনকার এই স্বপ্ন ও নবীনতাটুকু এই পত্রখানির কথার ঘায়ে তাসের ঘরের মতন সব ঝরে পড়ে যাবে! যাই হোক, একটা বিরক্তি ও আশঙ্কা নিয়ে সেটাকে খুলে পড়লুম।

সে লিখেচে—

"চিঠিখানা পেয়েছি। বাবা, মা, আমার জন্যে কাশী যেতে পারছেন না। তুমি এসে আমায় নিয়ে যাও। তুমি ছাড়া আর কে আমায় নিয়ে যাবে! তোমার জন্যে পথ চেয়ে রইলুম; চিঠি

পেয়েই রওনা হয়ো। তুমি কেমন আছ!—আমরা বেশ ভাল আছি। প্রণাম নাও। ইতি।

তোমার

'ম'

এবার ত আর দেরী বা ছুতো করা চলে না। মঞ্জীকে তাঁদের কাছে আর রেখে তাঁদের ভ্রমণে ব্যাঘাত দেওয়া মোটেই যুক্তি-সঙ্গত নয়। তাকে গিয়ে নিয়ে আসব। তারপর? তারপর যা হয় বা হয়ে থাকে তাই হবে। যাকে আমি ভালবাসি না, তার জন্য আর বেশী ভাবা যেতে পারে না।

চিঠিখানিকে পকেটে পূরে ঘরের ভেতর গিয়ে ইন্দুকে বল্লুম—"আমায় ত কাল সকালেই কোলকাতা যেতে হবে—"

"কেন? এত তাড়া—?"

"বিশেষ দরকার—আর তুমিও চল—"

"আমি—? হ্যাঁ—তাও হয়—" মনে হ'ল যেন সে আরও দুইচারদিন এখানে থাকতে চায়। বল্লুম—

"তুমি না গেলে অবশ্য আমার একদিক দিয়ে সুবিধে—"

"কি?"

"বাড়ীটার—একটু দেখা শোনা—"

"বেশ—তবে তুমি না আসা অবধি আমি থাক্‌ব—"

"আচ্ছা—"

সেদিন সন্ধ্যার প্রায় কাছাকাছি আমি একলাই বেড়াতে

গেলুম। কারুরই সঙ্গ ভাল লাগ্‌ছিল না; কেন না যার সঙ্গ আমার কাছে, আমার জীবনের মাঝে প্রিয় হয়ে উঠেছিল, সে আজ থেকে আমার থেকে যেন বহুদূরে সরে গেছে।

সন্ধ্যা উতরে গেলে বাড়ী ঢুকবার সময়, একটু ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখলুম যেন ছবির সঙ্গে ইন্দু ছবিদের বাড়ীতে ঢুক্‌ল—আর কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না।

ক্ষণিক পরে ইন্দু বাড়ীতে এসেই বল্লে—"তুমি কতদূর থেকে বেড়িয়ে এলে? আমরা একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলুম—।" ভাল কোরে কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছিল না; দুই একটা কথায় তার সেদিনকার হাজার প্রশ্নের উত্তরে সেরে দিলুম। পরদিন ছবিকে কিছু না জানিয়েই কোলকাতায় চলে এলুম।

মঞ্জী আমায় দেখেই বোল্লে—"একি চেহারা—?"

"কেন?"

"তুমি আরশী দিয়ে নিজের মুখ দেখ্‌তে না! তোমার যে খুব খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট গেচে তা বুঝতেই পারচি! আচ্ছা শরীরটা এমন নষ্ট কোরে কি লাভ?"

"আছে, নিশ্চয়ই আছে, নইলে তাই বা করব কেন!" মনটা বড় বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। মঞ্জীর এত ভালবাসা ও যত্ন আমার আদৌ ভাল লাগল না।

তার ওপর একটা বিদ্বেষ এলো; সে কিন্তু তা বুঝতে পারলে না। তবে কেমন একটা অর্থভরা দৃষ্টি দিয়ে আমায় খালি আঘাত কোরতে লাগল। তাতে আমার রক্তটা যেন গরম হোয়ে ফেনিয়ে

উঠতে সুরু কোরে দিলে। কিন্তু মেজাজটা প্রকাশ হবার কোন পথ পেলে না।

(৭)

মঞ্জীর ওপরে এতদিনকার বিচ্ছেদের পর যে ব্যবহার কোরেছি, সেটা স্মরণ কোরে মনে কেমন একটা বেদনা অনুভব কোরলাম। সে আমার স্ত্রী; তার দাবী ত যে কারণেই হোক্ আমার ওপর অনেকখানি? এতদিন পরে—যার সঙ্গে দেখা হ'ল, তাকে এমন শক্ত কথা বোলে ফেল্লাম?

মনে হল—যেখানে অসংযম সেইখানেই যত অনাচার ও অশান্তি! লক্ষ কোটি মানুষ যদি তাদের স্ত্রী নিয়ে সুখী হতে পারে, তবে আমিই বা হব না কেন? কিন্তু তারা সত্যই কি—না থাকুক্ ও ভাবনা। আমার ওপর তার যে অধিকার সেটা যে আজ আমি আবার নতুন কোরে তাকে ফিরিয়ে দিতে এলাম। পায়ের শিকলটাকে আরও নিবিড় কোরে যে বাঁধ্‌তে এসেছি। কাছের মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়েই হয়ত এমন অসংযম মনে এসে দেখা দিয়েছিল! আসুক্, সে আজ আবার আমার কাছে, তার নিজের ঠাঁইটুকুতে ফিরে আসুক্। আমার এ সৃষ্টিছাড়া মনকে আমি না বাঁধতে পারি, সেকি তার মুক্ত দুয়ারখানির ওপর দুটি হাত রেখে আগ্‌লে ধরে রাখতে পারবে না?

সেদিন বিকেলে তাকে গিয়ে বল্লুম—"মণি, যাবে?"

"হাঁ—রে—যাব না বুঝি? এতদিন ছেড়ে আছি—" বলে সে

আমার কাছে সরে এসে আমার মাথার উস্কো খুস্কো চুলগুলোকে সমান করতে লাগ্‌ল।

বল্লুম—"আমি তা বল্‌ছি না—"

"তবে—?"

মঞ্জী যে কাশী যাত্রীদের সঙ্গে যায়, এটা তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা;—কিন্তু এতকাল তাঁদের কাছে কাটানোর পর কি কোরে সে কথা তাঁরা আমায় বলেন?

যে মেয়েকে অগ্নি ও নারায়ণের সম্মুখে দান করা হ'ল, তার ওপরে যে কিছু দাবী তা যেন গ্রহীতারই। তাঁদের দেনা-পাওনা সেই দানের ক্ষণেই চোখের জলে সব ভেসে গেল!

বল্লুম—"কাশী যাবে?"

সে একটু চুপ্ কোরে থেকে বল্লে—"বাবা তো তাই বোল্‌ছেন। আমি কিন্তু তোমায় ছেড়ে আর একদণ্ডও থাক্‌তে পারবো না—"বোলে আমার বুকের ভেতর তার মুখ-খানা লুকালে। মনে হল এতখানি ভালবাসা মিথ্যাই এই নারীর অন্তরে আমার জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! তবুও তাতে আমার তৃপ্তি নেই? পূজার উপকরণটাই কি দেবতার কাছে সবচেয়ে দামী? যে হৃদয়খানি, অঞ্জলী বেঁধে সে দেবতাকে দান করে, সেটা তবে কি?

তেমনি কোরে দুজনে অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে বসে রইলুম।

হঠাৎ মুখটা তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বল্লে—"দেখ, আমি একদিন কি স্বপন দেখেছিলুম জান?"

"—কি ?"

"যেন—না বাবা বল্‌ব না। বড় লজ্জা করে—" বলে সে আবার আমার বুকের ভেতর মুখ লুকালে। আমার জানবার জেদটা বেড়ে গেল।

বল্লুম "লজ্জা কিসের ? না বল্‌তে হবে—"

"বল তুমি হাস্‌বে না ?"

"না—"

"না—ভাল কোরে বল—"

আমি গম্ভীর হয়ে বল্লুম—"না—হাস্‌ব না—"

"—যেন তোমার একটী খুব সুন্দর খোকা হয়েছে—"

কথাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ কোরে আমার মুখের দিকে সে তাকালে। অদ্ভুত বটে! আমি যা চাই, এ তা চায় না। অথচ বড় কাছের সম্বন্ধ আমাদের দুটির। আমাদের চিন্তার ধারাও দুটি বিভিন্ন পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে!

বল্লুম—"বেশ—কিন্তু তুমি ত বল্লে না যাবে কি না—"

"তুমি যাবে বল—"

"কিন্তু সে তো হয় না—"

"কেন ?" একটু চুপ কোরে থেকে আবার বল্লে "বাবা মার সঙ্গে বলে ?"

"না—তা নয়—তবে—" আমিও ঠিক ঐ কথাটাই মনে মনে তোলা পাড়া কোরছিলুম। এমন অতর্কিত ভাবে সে কথাটা তার মুখে শুনতে পাব এ আশা কোরি নি ;—একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম।

মঞ্জী বল্লে—“তবে কি ?”

“না সে যাক্—আচ্ছা তাই বেশ। তবে তোমাদের যাবার দু চার দিন পরে যাব—”

উত্তরটা শুনে তার এতখানি আনন্দ হল যে আমায় একসঙ্গে অনেকগুলো চুমো খেয়ে বল্লে—“দাঁড়াও—মাকে বোলে আসি—”

সে ঘর থেকে এক রকম দৌড়েই বেরিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এসে বল্লে—“সেই ভাল—তুমি তাহলে কাল আমাদের সবাইকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এস—?”

“আচ্ছা—” বোলে আমি বেরিয়ে পড়লুম।

(৮)

মঞ্জী চলে গেল।

পরদিন তাদের সবাইকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে হোটেলে ফিরে এলুম।

এবার সে যাবার বেলায় আমার মুখ দিয়ে তিনবার বলিয়ে নিয়েছিল—যাবো। এই বিদায়-ক্ষণে তার চোখের কোণে একটু জল এসেছিল কি না জানি না। কেন না কথাটা বোলেই সে মুখটি ফিরিয়ে নিলে আর গাড়ীটাও একটু জোর দিয়ে আমার কাছ থেকে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

সেই ছবিখানি, সেই কথাকয়টি ফিরে ফিরে মনে পড়তে লাগল! তেতলার একটা ঘরে, খোলা জানালার সমুখে দাঁড়িয়ে পার্কের কোল দিয়ে যে পথটি চলে গেছে, তার দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু ঐ কথা কয়টিই ভাবছি।

দূরে সহরের ধূমধূলি ভরা আকাশতটে ম্লান দিনান্তের শেষ আলোকটুকু নিঃশব্দে মুছে যাচ্ছে। পথের বুক ওপর দিয়ে অবিরল জন স্রোত, গাড়ী ঘোড়া চলাচলের কর্কশ কোলাহল আর তারি মাঝ হতে পথের ধারের ছিন্ন মলিন বসনা এক রাজপুতানী ভিখারিণীর মরুস্থলী কোলের একটী দূর অচেনা পল্লীর সহজ, করুণ, অলস সুরখানি মনটা আমার আরও যেন কেমন কোরে তুলছিল। মনে হ'ল, সমগ্র জীবনটাই আমার যেন এমনি মলিনতায় ঢেকে গেছে আর তার আড়ালে আড়ালে দিনের আলো এমনি কোরে হেসে চলে যায়, এমনি কোরে ঘরছাড়া আমিও পথের পাশে ভিক্ষার ঝুলি পেতে, হাত বাড়িয়ে কেঁদে কেঁদে মরছি।

হঠাৎ রাস্তা থেকে দু তিনটে লোক "চোর, চোর" "পাকড়ো, পাকড়ো" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্‌ল, নীচে পানে চেয়ে দেখলুম, একটা লোক কিছুদূরে পথদিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে পিছনে দুটো লোক "চোর চোর" বোলে ছুট্‌ছে।

দেখতে দেখতে এক যায়গায় ইতিমধ্যে একটী ভদ্রলোককে ঘিরে বেশ একটী জনতা দেখা দিল। ভদ্রলোকটি কিন্তু নিজের ছিন্ন পকেটটি হাতদিয়ে দেখতে দেখতে সবার কৌতূহল প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, ভীড় থেকে বার হবার চেষ্টা কোরতে লাগলেন।

মনে হ'ল যেন লোকটি আমার চেনা। আমি তিনতলা থেকে তাড়াতাড়ি নেমে, ভীড় ঠেলে তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে, অবাক্ হয়ে গেলুম!

"সতীশ—তুমি? কি ব্যাপার—?"

সে খপ্ করে আমার হাতটা ধরে তাড়াতাড়ি ভীড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বল্লে—

"হ্যাঁ—আগে এর ভেতর থেকে বেরিয়ে বাঁচি—"

আমি তাকে, আর কিছু জিজ্ঞাসা না কোরে, হোটেলে আমার সেই ঘরটায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা কোরলুম—

"কি হয়েছে? কোথায় এসেছ—?"

"হবে আর কি? পকেটে দুশো টাকা ছিল, সরে গেল—" বলে সে আমার বিছানার ওপর একটু স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ল। তার মানসিক অবস্থার দরুণ, আমি আর কোন প্রশ্ন না কোরে, শুধু বোল্লুম—"তার আর কি—দরকার থাকে আমার কাছে—"

"সে তো পরের কথা; আর নিতেও হবে তাই; তবে—"

আমি তার শেষ কথাটুকু শোনবার অপেক্ষায় রইলুম। কিন্তু সে তেমনিই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। একটু পরে গলার চাদরটা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে, অতি স্বাভাবিক সুরে, যেন কিছুই হয় নি, জিজ্ঞাসা কোরলে—

"মণি কেমন আছে?" শৈশব থেকে আমরা একই সঙ্গে পড়াশুনা কোরে এসেছি; যেদিন থেকে সব বুঝবার অহঙ্কারটা আমার মনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, সেইদিন থেকেই দেখছি যে সে বিপদকে অতি সহজভাবেই নিতে পারে! তবুও যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম!

উত্তরে বল্লুম—"ভাল আছে—।" মঞ্জীকে সে ছেলে বেলা

থেকেই জানে—কাযেই নামধরে ডাকে।

জিজ্ঞাসা কোরলুম—"কবে, কোথায় এসেছিলে—?"

"এসেছি কাল, উঠেছি একটা মেসে, এখানে কিছু কেনাকাটা কোরবার দরকার ছিল—যাবোও ঠিকছিল কাল বিকেলে। কিন্তু—"

"বেশতো, আমার কাছ থেকে—"

"তোমার কাছ থেকেই, যদি থাকে তো, অল্প কিছু নিতে হবে। যাক, সে হবে পরে। তুমি বা তোমরা যে কোথায়, কেমন আছ তার তো কোন খবরই আমাদের দাওনা। শান্তি বোল্‌ছিল যে তোমরা দুজনে আমাদের ওখানে একবার চলো—"

বল্লুম "আপত্তি নেই; তবে আপাততঃ হবে না, কেননা মঞ্জী তো নেই, আজ কাশী গেল।"

"তুমিও যাচ্ছো নিশ্চয়ই"? বলে সে কৌতুকভরে আমার মুখের দিকে তাকালে। কথাটা শুনে আমার একটু রাগ হ'ল। কেননা সে আমায় স্ত্রৈণ বোলত। আমার স্ত্রৈণ হবার আপত্তি অবশ্য ছিলনা, কিন্তু মঞ্জীকে পেয়ে মনের সে অবস্থা আমার আদৌ ঘটে নি।

হঠাৎ বোলে ফেল্লুম—"আমি কেন যেতে যাবো?"

"দেখা যাবে—"

"দেখা যাবে কি? আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি—"

"আমার সঙ্গে যাবে—? কেন বাজে কথা বোল্‌ছ?"

"চলো আজই—"

"থাক—" বোলে সে জানালার কাছে সরে এসে দাঁড়াল।

তারপর বল্লে—"দেখ বিশেষ কতকগুলো কাজ আমার বাকী আছে। আজ চল্লুম কাল এক সময় আসব তুমি হাজির আছ সব সময় নিশ্চয়ই।" বোলে সে চাদরখানা বিছানা থেকে নিয়ে ঘরথেকে বেরিয়ে গেল।

আমিও তার সঙ্গে নীচে, পথ অবধি এসে ফিরে গিয়ে ইন্দুকে চিঠি লিখতে বসলুম।

তখন সন্ধ্যা। পথের পাশে আলোর সারি, একটী একটী করে জ্বলে উঠ্‌ল। জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম। তেমনি ধোঁয়া আর তারি সাথে আঁধার তলে একটী ম্লান তারা ধীরে ধীরে স্পন্দিত হচ্ছে।

(৯)

পরদিন আমি যে স্ত্রৈণ নয়, একথাটা প্রমাণ কোরতে, সতীশের সঙ্গে তার দেশে রওনা হলুম।

ধূম ও আঁধারের ভেতর দিয়ে গাড়ীখানি ছুটে চলতে লাগ্‌ল।

জানালার ধারে আমার পাশে যে আরোহীটি বোসেছিলেন তিনি গাড়ী ছাড়বার পূর্ব্ব থেকেই, সকল বিষয় এমন সব মন্তব্য দিচ্ছিলেন যাতে করে মনে হচ্ছিল, লোকটা একজন মহা ওস্তাদ।

তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য, পকেট থেকে

গোটা চারেক বিড়ী বার কোরে, সতীশ আর আমার সামনে ধরে বল্লেন—"আসুন?"

আমরা উভয়ে—প্রত্যাখ্যান করতেই—

"একেবারে গুড বয়" বলে তিনি একটু হাসলেন। অন্ততঃ আমি তাঁর এ ব্যবহারে একটু অপমানিত বোধ করলুম। কিন্তু তিনি পরক্ষণেই বলে উঠলেন—"ভাল—ভাল। সকলেই যদি আপনাদের মত হ'তে পারত তাহলে ভাবনা ছিল কি?" তারপর "আপনাদের নিবাস—?" বোলে আমার দিকে চাইলেন।

বল্লুম—"বর্ত্তমানে পশ্চিমে—"

"পশ্চিমে?—বাঙলায় থাকেন না?"

সতীশ একটু বিদ্রূপের স্বরে—"আজ্ঞে না—উনি বেহারী—"

—"ছাতুর দেশে?" বোলে ভদ্রলোকটি একটু অবজ্ঞার হাসি হাস্‌লেন। আমার একটু বিরক্তি বোধ হল, উত্তরে বোললুম—

"আপনি কি বোল্‌তে চান যে, তারা মানুষ নয়?"

"মানুষ? হ্যাঁ, তা না হ'লে কি কোরে আর বাঙলার গাড়োয়ানী, চাকরগিরি, দরোয়ানী ইত্যাদি চলে বলুন—?"

বল্লুম "হ্যাঁ তাই তারা আপনাদের তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে—"

"ঠিক ঐটেই তাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয়—তা জানেন?" বলে তিনি একট উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন।

সতীশ বল্লে—"দেখুন তা বড় বলা যায় না। ইংরেজদেরকে আমরাও আর আমল দিতে চাইনে। তাতে কোরে এ বলা

চলে না যে আমরা—নীরেট। যে চোখ দিয়ে ইংরেজরা আমাদের দেখে থাকে, আমরাও বেহারী কেন ভারতের বাঙালী ছাড়া আর সব জাতকে সেই চোখে দেখি। হয়ত তারা সব আমাদের চেয়ে কিছু পিছিয়ে পড়ে আছে—তাই বোলে অবজ্ঞা দিয়ে, তাদের সরিয়ে রাখবার ত অধিকার আমাদের নেই—"

"কেন নেই? মশায়, ইংরেজরা যে চোখে আমাদের দেখে, তা তাদের সাজে।"

সতীশ—"তার প্রমাণ তো রাজা হয়ে বোসেই করা যায় না—।"

"প্রমাণ হচ্ছে—আর আপনি বোল্লেই হল না?"

সতীশ বল্লে "আচ্ছা যাক্ সে কথা—আমি বোলছিলুম বেহারীদের কথা—"

"হাঁ—কি বলুন—" ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

সতীশ—"দেখুন, তাদের ছোট কোরে দেখেই ত আজকের ঝগড়া বেধে উঠেছে—"

"না তারা বুদ্ধি-বিদ্যেয় পারেনা, তাই বাঙ্গালীর ওপর যত রাগ। বেহারী আর উড়ে ছাড়া আর কেউ বাঙালীকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কি? আমি ভারতবর্ষের চারিদিকে ঘুরে দেখেছি—"

"তার কারণ আর দেশগুলো বাঙালা থেকে অনেক দূরে, বাঙ্গালীর মত একটা জাত যদি তাদেরও পাশে থাক্‌ত, তাহলে

দেখতেন। ওটাকে আমি ভারতের দুর্ভাগ্য বলি। শুধু এই আমাদের দেশ বোলেই নয়—যাদের আপনারা বড় বোল্‌ছেন, তারাও এই প্রতিবেশী বিদ্বেষে জ্বলে পুড়ে মরছে।"

গাড়ীখানা এমন সময় একটা বড় জংসনে এসে পৌছল। তাদের তর্কের ফোয়ারা তখনকার মতন বন্ধ কোরে ভদ্রলোকটি দু'একটী সওদায় মন দিলেন। তাদের দুজনের তর্কে আমার এতটুকু মনোযোগ দিতে ইচ্ছা করছিল না। মিথ্যেটাকে জোর কোরে চেপে, সেটা যে আমার কাছে পরম সত্য, এটা প্রমাণ করবার জন্য, আমি সতীশের সঙ্গে চলেছি, এরই বিড়ম্বনাটা আমায় বিষম পীড়া দিতে লাগল। এর দরকার যে কি ছিল, মনে মনে তারই কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলুম।

কত যাত্রী এল, গেল ; আবার গাড়ী ষ্টেশন পেরিয়ে অন্ধকারে ছুটতে লাগ্‌ল, তারা আবার তর্ক সুরু করলে। কে বড়, কে ছোট এই নিয়ে কথার জাল বুনে ন্যায়, নীতি কিছুই তারা বাদ রাখলে না।

হঠাৎ গাড়ীর ভেতর চীৎকার হ'ল "সব অভদ্র—!" চমকে উঠলুম। মনে হ'ল—এই কি "ছোট বড়" তর্কের ফল ? তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে ভেতরে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম—সতীশদের তর্ক প্রায় থেমে এসেছে ; তাদের দুজনকে ত উত্তেজিত বোলে বোধ হল না।

আবার শব্দ হল—"নিশ্চয়ই অভদ্র ; একশবার অভদ্র—মেয়েদের যারা সম্মান দেখায় না—"

সে শব্দের উত্তরে কে যেন বল্লে—"মশায়, তাঁদের ত ব্রোস্‌তে যায়গা দেওয়া হ'ল—"

"জায়গা দেওয়া হল বোল্লেই হ'ল অমনি ?"

আমাদের সম্মুখে গাড়ীর মাঝখানে নূতন আরোহীদের একটা ভীড় জমে উঠেছিল—দেখলুম তার আড়ালে একটী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আর একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া কোরছেন। কিন্তু মেয়েরা যে কোথায়, তা চোখে পড়ল না। তিনি আবার বোলে উঠ্‌লেন—

"এর চেয়ে মেয়েদের দাঁড়িয়ে যাওয়া ভাল—অভদ্র সব।"

"বাবা, ও বাবা, মা বোল্‌ছে পরের ইষ্টিশানে গাড়ী থাম্‌লে "সেকেন্ কেলাসে" চল—।" তাকিয়ে দেখলুম, গাড়ীর এক কোণ থেকে একটী ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে এই কথাগুলো বলে উঠল। তার পাশে একটী মহিলা ঘোমটা দিয়ে, একটু কুঁজো হয়ে বসে আছেন। যে ভদ্রলোকটির পাশে মহিলাটি বসেছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"মশায়, মেয়েদের গাড়ীতে ওঁদের দিলেই ত পারতেন—"

ক্রুদ্ধ ভদ্রলোকটি বল্লেন—"সে আমার খুসী—"

আর একজন বল্লেন—"খুসী তো পুরুষদের ভেতর মেয়েদের আনবার অসুবিধেটা ভোগ করুন—"

ক্রুদ্ধ ভদ্রলোকটি তার কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর স্ত্রীর পার্শ্বের সন্তশূন্য স্থানটুকুতে অবিলম্বে উপবেশন করে, আমাদের দিকে একবার ফিরে তাকালেন মাত্র। মনে হল, তিনি যেন পরম সোয়াস্তি লাভ করলেন।

সতীশের সঙ্গে যিনি তর্ক করছিলেন, তিনি বল্লেন—"বিবি সাজাতে চান অথচ আর একটা পুরুষ পাশে বসলেই বুক চড়্ চড়্ করে! বল্লেই হয় বাবা, যে আমায় পাশে বোসে আগলাতে দাও—। দেখুন মশায়, এই, গাড়ীতে যেমন লোক চেনা যায়, এমন আর কিছুতেই যায় না।"

সতীশ বল্লে "যথা—?"

"যথা যে ১০৲ টাকা মাহিনা পায় আর যে ৩০০৲ টাকা রোজগার করে দুজনেই টিকিটের সমান দাম দিয়ে একই শ্রেণীর গাড়ীতে উঠে এক আসনের অধিকারী হলেও ছোট যে সে ভাবে এ গাড়ীর সবাই আমার মতন; আর বড় যে সে ভাবে যদিচ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, তথাপি আমার পদমর্য্যাদা আছে—।"

আমরা সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠ্লুম।

বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোকটি একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামলেও আর "সেকেন কেলাসে" গেলেন না বা তার যে এতটুকু দরকার আছে, তা তাঁর ব্যবহারে মনে হ'ল না।

রাত্রিটা তখন অনেক, সকলেই নিদ্রালু। বহুক্ষণ গাড়ী চলবার পর একযায়গায় গাড়ীখানা গতিহারা ও স্তব্ধ হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

ব্যাপার কি জানবার জন্যে কেউ কেউ আমরা বাইরে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালুম।

কিন্তু চোখে পড়ল আকাশ ছাওয়া ঘন কালো মেঘ, আঁধার ঢাকা দিগদিগন্ত। চারিদিক নিবিড় নিস্তব্ধ। কানে এল কেবল রেল

পথের ধারে, বিলের কূলে সজল হাওয়ায় কাশের বন নুইয়ে বয়ে যেতে যেতে ফিস্ ফিস্ কোরে কি যেন বলার শব্দ, আর বিল পার হয়ে দূর বনের দু' একটী পাখীর অস্ফুট স্বপ্ন-প্রলাপ।

গাড়ীটা কেন যে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ মাঝপথে থেমে পড়ল, আমরা কেউ বুঝ্‌লুম না। আবার একটু পরে তেমনি যেন অকারণে চল্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে! কিন্তু ভদ্রলোকটি হঠাৎ বল্লেন—"বুড়ো গুমটিওয়ালা মরেও লাল বাতি দেখাবার অভ্যাসটা ছাড়েনি। মাঝে মাঝে তাই গভীর রাত্রে দু'চারখানা গাড়ী চল্‌তে চল্‌তে থেমে যায়!" এটা যে একটা নিছক গল্প, তা সকলেই বুঝলেও অকারণের এ কাণ্ডটার এমন কারণ শুনে সকলেই আমোদ উপভোগ করলুম।

তারপর রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমরা দুজনে গন্তব্যস্থানে প্রায় এসে পৌছলুম। গাড়ী থেকে নামবার পূর্ব্বে ভদ্রলোকটি সতীশকে বল্লেন—"মশায় লক্ষ্ণৌএ একটা লোককে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, মনে পড়ে?"

সতীশ একটু ভেবে বল্লে—"হাঁ।"

ভদ্রলোকটি—"সে কিন্তু সত্যই একজন পকেটকাটা। আমায় চিনতে পারেন?"

সতীশ তার মুখের দিকে ভাল কোরে ঠাউরে বল্লে—"আপনিই তিনি যে।"

"হাঁ—আচ্ছা, আজ বিদায়।"

আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। বাড়ী পৌছে সতীশ

পকেটে হাত দিয়ে একতাড়া নোট বার কোরে বলে উঠল—"সে কি! সেই দুশো টাকার নোট যে।" তারপর নোটগুলো খুলে দেখালে। ঘটনাটা একটু বিচিত্র ঠেকল।

(১০)

সতীশ তার পল্লীখানিকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটীও অনাবশ্যক ঝোপঝাড় কোথাও নেই। সে কি করে যে এ দুঃসাধ্য সাধন করলে, আমি ভেবে পাই না। তার বাড়ীখানিও বেশ ফিটফাট—সাদাসিদে।

শেষ বেলার দিকে আমি একলাটি বেড়াতে বেরিয়েছি।

দুটি পাশে, সমুখে পিছনে আধ পাকা ধান ভরা বহুদূর বিস্তারি ক্ষেত। তারি মাঝ দিয়ে তরুণীর সিঁথিটির মতন পায়ে চলা পথ রেখাটি, এঁকে বেঁকে ধানের আড়ে মিলিয়ে গেছে। বাতাস আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে ক্ষেতের বুকে গুঞ্জরণ তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে! মন চাইছিল—এরি মাঝ দিয়ে আমি কেবল চলি! এমনি কোরে গান ভরা ক্ষেত আমার পথ আড়াল কোরে বিছান থাক, অমনি একটা ব্যথা-ভরা সুখের স্বপ্ন মাথার ওপরকার নীলাকাশ ভরে রেখে দিক্—আমি কেবল চলি।

পশ্চিম আকাশের কোলে সন্ধ্যা তারাটি স্থির আঁখি মেলে ক্রমে দেখা দিল। যে পথে এসেছিলুম একলা, আবার সেই পথ

ধরে ঘরে ফিরে চল্লুম। দেখলুম গ্রামের ভেতর একটা বড় বাঁশঝাড়ের আড়ে, একখানি মেটে বাড়ীর একটু দূরে, একজন লোক একটী অর্দ্ধ মলিন বসনা ষোড়শীকে বোল্‌ছে—"রবিজান্, আর আমাদের বাড়ীতে আসিস্ না কেন?" ষোড়শী মুখ নীচু কোরে একটু সলজ্জ হাসি হাস্‌লে। ঠিক সেই সময় কে একজন প্রৌঢ়া গোছের স্ত্রীলোক, আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় একটা বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে, তাদের দিকে চেয়ে চোরের মতন নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। তারা দুজনে যে পথটিতে দাঁড়িয়ে কথা বোল্‌ছিল, সেটা সেই বাড়ীতে গিয়ে উঠানের সঙ্গে মিশে গেছে। আমি তার পাশের আর একটা পথ দিয়ে চলেছি।

লোকটি মেয়েটির কাছে আরও এগিয়ে গিয়ে বল্লে—"তোর মা বকে?" দেখে মনে হল, তার হাতদুখানি যেন ষোড়শীকে বাঁধবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

"না বাবু আমি যাই—" বলে মেয়েটি সেই প্রৌঢ়ার দিকে চেয়ে একটু ইঙ্গিত কোরলে; তারপর আমি যে পথে চলছিলুম সেই পথ দিয়ে একটু ঘন ঘন পা ফেলে, আমার আগে আগে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সহসা কানে এল—"বেদেনীর সঙ্গে এখন জুটেছ? বুড়ো বয়সে ভীমরতি? এতকাল আমায় দিয়ে—"

উত্তরটাও শুনতে পেলুম—"চেঁচিও না বল্‌ছি—বেশ কর্ব্বো।"

তখন দূরে চলে এসেছি; তবুও বোধ হল বেশ একটা দম্পতি-

কলহ বেধে উঠল। কিন্তু অস্পষ্ট একটা কথার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলুম না। আর সেই মেয়েটিও তখন বাঁশ বন পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

ব্যাপারটি যে কি তা বুঝতে বাকী রইল না। বাড়ীতে এসে সতীশ ও তার স্ত্রী—শান্তিকে—খবরটা দিয়ে ফেল্লুম।

সতীশ বল্লে—"ভদ্রলোকটির স্ত্রীটিকে নাকি আর মনে ধরে না—"

আমি বল্লুম—"তা না ধরাটাও আশ্চর্য্য নয়—ঐ ত শ্রী। তার ওপর এখন—"

"ছিঃ! তোমাদের ঐ সব কথা নিয়ে আবার আলোচনা?" বোলে সতীশের স্ত্রী মুখখানা একটু ফিরিয়ে নিলে।

শান্তির আঁট আঁট ভরন্ত মেয়েলি গড়নের ওপর একটা উজ্জ্বল শ্যামল রঙ্ মাখান। মুখখানি সাদাসিদে; গোল হাত দুখানিতে শাদা দুগাছি শাঁখা, পরিধানে একখানি পরিষ্কার লাল চওড়া পাড় সাড়ী আর সিঁথেয় সিঁদূর দিলেই তাকে বেশ মানিয়ে যেত। আমার চোখে তাই ভাল লাগত।

বল্লুম—"কেন, কথাটা কি খারাপ?"

শান্তি বল্লে "তা নয়ত কি? তবে বিয়ে কোরতে গেল কেন? এখন যে বড়—"

"দেখ বৌদি—" অন্য কোন সম্বোধন বা সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে আমি তাকে "বৌদি" বোলেই ডাকতুম—"বিয়ের আগের চোখ লোকে বিয়ের রাতেই খুইয়ে বসে; কিন্তু তখন সে তা টের

পায় না। বিয়ে যে কেন কোরতে গেল তার উত্তর নেই। কেন না ওর ঠিক কারণ সে খুঁজেই পায় না—"

"তাই বোলে সে তার স্ত্রীকে ভালবাসবে না—? কি যে সব কথা —!"

"সে কথা ত কেউ বলে না। কিন্তু দেখা যায়, বিয়ের পরেও মানুষের বাইরের দিকে টানটা যেন সময়ে সময়ে বেড়ে যায়। আর ভালবাসা ত জোর কোরে বা কর্ত্তব্যের খাতিরে হয় না—আমি তো বলি ও লোকটা ঠিকই কোরেছে।"

"তা হলে, মেয়েদের অমন হতে দেখ্‌লে পুরুষরা ক্ষেপে ওঠে কেন?"

"সেটা তাদের ভুল। স্বামীকে স্ত্রী যদি ভাল না বাসতে পেরে আর কাউকে ভালবাসে—"

সতীশ বলে উঠ্‌ল—"তা হলে স্ত্রীজাতি অবশ্য বধ্য—"

বল্লুম "না—"

সতীশ উত্তর করলে "হ্যাঁ। তোমার নভেলিয়ানায় ওটা চলে, নিত্যকার জীবনে তার উল্টো—"

"দ্যাখ, আমার স্ত্রী যদি আজ আর আমায় না ভালবাসে, তা হলে—"

সতীশ—"তুমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কর—"

কথাটা শুনে আমার রাগ হল। বল্লুম—"না তা খাইনা, কেননা আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি না—"

"তাই সাত তাড়াতাড়ি কাশী ছুটেছিলে—"

সমস্ত মনটা আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। মঞ্জীকে আমি ভালবাসিনা, বাসতে পারি না, বাসবও না! কি আছে তার?

রাগের মাথায় বলে ফেল্লুম—"ঐ ত চেহারা, তার জন্যে—"

শান্তি যেন শিউরে উঠল। বল্লে "ওমা ছিঃ! তোমরা সব কি কোরছ বলত? সে বেচারি তোমাদের কি কোরলে?" বলে সে সতীশের দিকে ভ্রূ কুঞ্চিত কোরে তাকালে! সতীশ একটু হেসে বল্লে—"ওকে রাগিয়ে বেশ মজা—

শান্তি আর তিলমাত্র সেখানে অপেক্ষা না কোরে একটু যেন বিরক্তিভরেই রান্নাঘরে চলে গেল। আমরা দুজনে রোয়াকের ওপর একটা বড় মাদুর পেতে দুটো বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম।

মনটা ছুটে গিয়ে কাশীর একটা বাড়ীতে, মঞ্জীকে ঘিরে ঘিরে ব্যর্থ ক্রোধের আস্ফালন কোরতে লাগ্‌ল। সতীশও যেন মনে হ'ল কি একটা ভাবছে এবং সেটা যেন আমাদেরই সংক্রান্ত।

(১১)

পরদিন সকালে হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

এক সঙ্গে চার পাঁচটি কণ্ঠ বাইরের দিককার রোয়াকে বেশ উঁচু গলায় কি সব বলাবলি কোরছে। মনে হ'ল তারা অনেকক্ষণ ধরে যেন এক যায়গায় জটলা পাকাচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলুম, সতীশ তার বিপুল দেহখানা নিয়ে তাদের মাঝে বসে, মনোযোগের সঙ্গে তাদের সব কথা শুন্‌ছে। আমায় দেখে সতীশ বল্লে—"তোমার ঘুম ভাঙল?"

"তা আর ভাঙবে না? গলার আওয়াজটা ত আর কম হচ্ছেনা—"

আমি মুখ ধুতে বাড়ীর ভেতর চলে এলুম। সতীশের স্ত্রী উঠোনের একটা কোণে, প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে, কি যেন একটা কাযে ব্যস্ত ছিল!

দেখে বল্লুম—"বৌদি, প্রাতঃপ্রণাম—"

"বাবাঃ—ঘুম ভাঙল?—"

"সবাই ঐ কথা বোল্‌ছ—এদেশের লোকে কি ঘুমোয় না?—"

"ঘুমোবে না কেন—রোদ ওঠবার আগেই তারা বিছান ছাড়ে—"

তখন গাছের মাথায় মাথায় প্রভাত আলো ঝলমল কোরছে। আমি মুখ ধুয়ে বাইরে এসে দেখলুম সতীশ একা;—তারা চলে গেছে।

বল্লুম—"তোমার তারা কোথায়—?"

"মাঠে চলে গেল—"

"কি সব জটলা হচ্ছিল?"

"জটলা সেই পুরাতন কাহিনী! দুঃখ-কষ্টের নিবেদন—" বলে সে উঠে দাঁড়াল।

আমি—"চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক—আর চিঠিখানাও অমনি ডাকে দেওয়া হবে—"

"চিঠি আবার কার—?"

"দেখ—"বোলে তার হাতে খামখানা দিতে গেলুম। সে না নিয়ে বল্লে—

"নাঃ—তোমার ছেলে মানুষি আজও গেল না—"

"ছেলে মানুষি কি? কি লিখেছি তা জান?"

"জান্‌তে চাইনে—"

"দেখ, নিজে সুখী হয়েছ বোলে যে আর পাঁচজন তেমনি হবে তা নয়। তোমার সুখী হবার কারণ আছে—"

"আর তোমার নেই?—"

"না—"

"তা বল্‌বে বৈকি? মানুষের সুখের পথ একটা নয়। একদিক দিয়ে না ভরলেও, সে আর একদিকে সফল হতে পারে। আমার বৌ তোমার বৌয়ের চেয়ে কিছু দেখতে ভাল। তাই বোলে তো সে সুন্দরী নয় আর সুন্দরীর তুলনায়—"

"তোমার হয়ত তাতেই তৃপ্তি; আর আমার যে ওটুকুও নেই। আমি বুঝি সব আগে রূপ দেহের, তারপর রূপ মনের—"

"আচ্ছা যাক ওসব কথা—ঐ যে আমগাছের পাশে চিঠির বাক্স—"

আমি চিঠিখানা ডাকে দিলুম। দেবার সময় মনে হ'ল, যেন একটা শক্ত কাজ কোরছি!

চল্‌তে চল্‌তে আমরা দুজনে গ্রামের শেষ সীমানায় একটা ছোট নদীর ধারে এসে পড়লুম। ওপারে নদীর জল অবধি বাগান আর বাড়ীগুলি এগিয়ে এসেছে। গ্রামখানার দুপাশে বিশাল দুখানি

শস্য ক্ষেত। আর তারও ওধারে আবার তেমনি ছোট দুটি ছায়া-ঘেরা গ্রাম। এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের ছবিখানা বড় সুন্দর লাগছিল; জানিনে ওপারে যারা আছে, তাদের চোখেও আমাদের এপারের এই শ্যামল তরুলতা ও শস্য ভরা ক্ষেতে ছাওয়া ঠাঁইটুকুকে স্বপ্নের মতন ঠেকে কিনা।

হঠাৎ চোখ পড়ল, আমাদের থেকে কিছু দূরে একটা বাঁকের ভেতর, একখানি ছোট নৌকা জাল ফেলে মাছ ধোরছে। সতীশকে বল্লুম—

"ওহে চল, কিছু মাছ কেনা যাক—"

একটু এগিয়ে গিয়ে সতীশ জিজ্ঞাসা কোরলে—"মাছ আছে—?"

উত্তর হ'ল "না—"

কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না। বল্লুম—"মিছে কথা বল্‌ছে লোকটা—"

"কি কোরে বুঝলে? এই সবে তো মাছধরা আরম্ভ কোরতে পারে? আর তা ছাড়া জাল ফেল্লেই কি মাছ ওঠে? তবে ওরা যদি মিছে কথা বলে তো, আমি কিছুমাত্র দোষ ওদের দিই না। অনেক সত্যি কথা ওরা বলেছে, কিন্তু তার ফল হয়েছে ওদের ওপর জোর জুলুম। এই বিশাল ভারতের এমন একটা জায়গা আছে কি, যেখানে এই অজ্ঞ, সরলদের দুঃখের কাহিনী না শোনা যায়? এদের ওপর জবরদস্তি, জুলুম না চল্‌ছে? ঐ যারা এসে চলে গেল—ওরাও ঠিক ঐ কথাই জানিয়ে গেল—বড় দুঃখ!"

"তুমি তার কি কোরবে ?"

"আমি আর কি কোরতে পারি ? কৃষাণ চাষীদের বরাবরই দূরে সরিয়ে রেখে, তাদেরই রক্ত শোষণ কোরে বেঁচে আছি যদিও, তবুও কিছুই কি করবার আমাদের নেই ? এত বড় একটা শক্তি, ভারতের বিশাল বুকে ঘুমিয়ে আছে—যা না জাগ্‌লে আমাদের মঙ্গল নেই—তাদের সঙ্গে মিশতে অবধি আমরা শিক্ষাভী-মানীরা জানিনা, তাদের দুঃখ দূর করা ত দূরের কথা। কতখানি যে নিজেকে গড়ে তুলে, তবে ওদের সঙ্গে মিশতে হবে, তার হিসেব কিন্তু কেউই কোরছে না। অথচ বোলছে—চল, ওদের মাঝে চল—।"

বল্লুম "শিক্ষিত আর ওদের মাঝে একটা স্বাভাবিক ব্যবধান বরাবর থাক্‌বেই—"

সতীশ বল্লে—"সেটা আমি মানিনে। যে শিক্ষা একটা দেশের জাতি পরস্পরের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপনার ক্ষেত্র না গড়ে তোলে, সে শিক্ষা মনুষত্বের পক্ষে অকল্যাণের। ভারতের সঙ্গে এই জায়গায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিশাল রুষ দেশের একটা মিল ছিল। সেখানেও এই ব্যাপারের ছবি দেখা যেত !

"কিন্তু আর সব দেশের শিক্ষিতরা যে আজ এদের সঙ্গে মিশ্‌ছে না এ বলা চলে না।"

"হ্যাঁ, মিশ্‌ছে, আমি মেনে নিচ্ছি—কিন্তু তাদের সঙ্গে মনের দেনা-পাওনা আজও তেমন কোরে আরম্ভ হয় নি—তাই যত পরিশ্রম সব ব্যর্থ—! এরা শিক্ষিতদের বিশ্বাস করে না। আর

ঐ মেশটাও হচ্ছে সাময়িক। মুষ্টিমেয় জন কয়েকের রাজনৈতিক কোন একটা সুবিধার জন্যে, এই মেশটা। কাজেই তাতে ভালবাসার গন্ধও নেই—।”

কথায় কথায়, চল্‌তে চল্‌তে, আমরা বাড়ী অবধি কি কোরে যে চলে এলাম, কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলাম না।

আমাদে রদেখে শান্তি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বল্লে— “কি গো, তোমরা খাওয়া-দাওয়া সব ভুলে গেলে যে?”

সতীশ বল্লে—“সেটা নিখিলকে বল। ও রাগের মাথায় সব ভুলে গেছে—”

শান্তি—“সত্যি—?

আমি—“তা যাই বল—”

আমাদের কথার ফাঁকে “কার চিঠি?” বোলে সতীশ এগিয়ে গেল। ফিরে দেখলুম পিওন সতীশের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে চলে যাচ্ছে।

“এই নাও—” বোলে আমার হাতে সেটা দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে ভেতরে চলে গেল।

চিঠিখানা ইন্দুর। কলিকাতায় থাকতে, যে চিঠিখানা তাকে লিখেছিলুম, তারই উত্তরে সে লিখেছে, ছবিরা চলে যাচ্ছে। সেও আর থাকতে পারবে না; বিশেষ কাজে তাকেও যেতে হবে। এবং সব শেষে লিখেছে—ছবি সুনীলবাবুর আপন বোন্ নয়। ছবির বিয়ের ঠিক হয়েছে, বিজয়বাবুর সঙ্গে। কিন্তু সে তাতে রাজী নয়। তার দাদা তাতে আশ্চর্য্য প্রকাশ করে বোলেছেন যে, এর আগে এ

আপত্তিটা সে করেনি কেন? কিন্তু ছবি তার কোন উত্তর দেয় নি।

আমি চিঠিখানা পড়ে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝ্তে পারলুম না। আর ইন্দুই বা কি কোরে এত কথা জান্লে? ছবি বোলেছে নিজে? যদি তাই হয়?—মনে একটু ঈর্ষার সঞ্চার হ'ল। আমায় বিশ্বাস কোরে, সে এ কথাটা বোলতে পারলে না? একটা নারীর মনের কথা জানবার সৌভাগ্যও আমার নেই? আবার চট্ কোরে মনটা একটা তৃপ্তিতে ও সুখে ভরে গেল—হয়ত আমার জন্যই সে বিয়েতে আপত্তি কোরেছে!

ভেতরে চলে গেলুম। সতীশ জিজ্ঞাসা কোরলে "কার চিঠি?"

"ইন্দু ঘোষের—"

"কোথায় সে?"

"আমার বাড়ীতে—"

"কি লিখেছে?"

"সব বাজে কথা।—আমি কাল চলে যাবো। কাশী যাওয়া হবে না; মণিকে লিখেছি তাই।"

"তাহলে তুমি একটা জরুরী কাজে পড়েছ?"

"কেন?'

"চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোলছ কালই যাবে—তাতে তাই বোঝায়—"

"তবে তাই—" বোলে আমি যে ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই ঘরে চলে গেলুম।

রাত্রে শান্তি ও সতীশ একসঙ্গে জানিয়ে দিলে আমায় যে, তারা কিছুদিন পরে, যত শীঘ্র পারে আমার বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাক্‌বে ; অতএব মঞ্জীকে আনা চাই। আমিও সম্মতি জানালুম।

পরদিন ভোরে তাদের বাড়ী ছেড়ে চলে এলুম।

(১২)

ছবিরা চলে যাচ্ছে। কিন্তু কবে ? সে কথাটা ইন্দু আমায় লেখে নি। ট্রেণে এই কথাটা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি।

কতদূরে চলে এসেছি। গৃহের দূরত্ব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, মন আমার আশা নিরাশায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। কোথা এ পথের শেষ ;—এ চলার সার্থকতা আছে কি ? না মিথ্যাই এই পথ-ক্লান্তি বওয়া !

হঠাৎ চোখে পড়ল, যেন একখানা রাঙাপাড় শাড়ীর একটুখানি ও চেনা মুখের একটী ধার। তার পাশে দুজন বাঙালী সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়, আমাদের গাড়ীখানা ষ্টেশনে লাগতে না না লাগতেই বিপরীতগামী গাড়ীখানায় চলে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে জানালা দিয়ে দেখ্‌তে গেলুম। মনে হ'ল—ঐ যেন তারাও মুখ বাড়ালে, কিন্তু চেনা মানুষকে চিনতে ভুলে গেল ! ইচ্ছে হল নাম ধরে ডাকি ;—

"ছবি !" "সুনীলবাবু !" বলি—"আমি" কিন্তু সেই গাড়ীখানা তখন ষ্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে, আমাদের গাড়ীকে পিছনে ফেলে, পথের আঁ.ধারে মিলিয়ে গেছে !......

বাংলাদেশ থেকে আজ আমি যে বহুদূরের পথে চলে এসেছি ; পৃথিবীর বুকে যেখানে আমার সব কিছু রইল—সেই সুন্দর। কিন্তু সে যে দূর হতে দূরে সরে গেল !

* * * * * *

একলাটি আমার অন্ধকার বাড়ীর সমুখে দাঁড়িয়ে চাকরটাকে ডাকলুম! তাকিয়ে দেখলুম, ছবিদের বাড়ীখানা নিস্তব্ধ ও অন্ধকার।

চাকরটা বেরিয়ে এসে, আমায় দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা কোরলুম—

"ইন্দুবাবু গেছেন ? ওবাড়ীর মাজীরাও গেছেন ত ?"

সে বল্লে—"হাঁ, বাবুর অনেক আগে—"

আমি আর কিছু না বোলে, ঘরে গিয়ে আলো না জ্বেলেই হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে, বাইরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালুম !

কেমন যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব, কেমন যেন বেদনা ও ক্ষুব্ধতা চারিদিকে বেজে বেজে উঠ্‌তে লাগল। মনে হ'ল, যেন একটা চাপা কান্নার সুর চারিদিক হতে অতি ধীরে ধীরে উঠে, ওই তারা ভরা আকাশের গায়ে, সপ্তর্ষীর পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ছে।

সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর, মনে হল অন্ধকারে অন্ধকারে পথ দিয়ে, কারা যেন আমার বাড়ীর একেবারে কাছে এসে পড়েছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে, দৃষ্টিটা যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ কোরে দেখলুম ! তারা আরো কাছে এসে পড়ল !

"ইন্দু—?"

"হ্যাঁ—"

আমি দৌড়ে তাদের কাছে যেতেই, তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠ্ল—"আপনি—তুমি?"

"হ্যাঁ—যাক্! আমি মনে করেছিলুম কেউ নেই—।" মন সোয়াস্তি ও তৃপ্তিতে ভরে গেল!

সুনীলবাবু বল্লেন "আপনি হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন?"

"একটু ঘুরে এলুম। বিজয়বাবু কোথায়? তাঁকে দেখ্ছি না কেন?"

"কাল চলে গেছেন—"

ইন্দু ও ছবি একটু দূরে দাঁড়িয়ে, আমাদের কথা শুন্ছে।

সুনীল বাবু বল্লেন—"তা আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে—"

"হ্যাঁ—চলুন—" বোলে তিনি আর আমি আগে আগে চল্লুম, ছবি আর ইন্দু তেমনি চুপ কোরে আমাদের পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগল!

ছবি সেই গোড়ায় যা একবার মাত্র মৃদুভাবে আশ্চর্য্য প্রকাশ কোরেছিল আমায় দেখে, তারপর সে বা ইন্দু একটী কথাও বলে নি! একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম!

ছবির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা কোরলুম—

"আর নতুন কোথায়ও বেড়ান হ'ল?"

"না—"

ততক্ষণে আমরা সুনীলবাবুদের বাড়ীর দরজায় এসে পড়েছি। ইন্দু বল্লে—"তা হলে ফেরা যাক্—"

ছবি জিজ্ঞাসা করলে—"আপনারা আসবেন না ?"

সুনীলবাবু—"উনি বোধ হয় এই সবে এলেন ; এখন কষ্ট দিয়ে লাভ কি ?"

আমি—"না কষ্ট নয়—তবে! যাক্—বেশ কাল সকালেই আসা যাবে! কি বল ?" বোলে ছবির দিকে চাইলুম। সে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। কিন্তু তার মুখের ভাবটা সেই অন্ধকারে আমার চোখে পড়ল না।

তারা চলে গেল।

পথে আস্‌তে আস্‌তে ইন্দু জিজ্ঞাসা কোরলে—"হঠাৎ চলে এলে যে ?"

"ভাবলুম তোমরা হয়ত চলে গেছ—"

"তাই আমাদের দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলে ? এত শীঘ্র যে যাবো ঠিক হয় নি।"

"আশ্চর্য্য হবারই ত কথা। লিখেছিলে যে 'ছবিরা চলে যাচ্ছে' আর তুমিও যাচ্ছ—। চাকরটাও যেন বল্লে তোমরা চলে গেছ—।" পথে আমাদের আর কোন কথা হ'ল না। বুঝলুম, আগাগোড়াই আমার বোঝবার ভুল ঘটেছে। সেই যাদের গাড়ীতে দেখেছিলুম—তারাও আর কেউ।

বাড়ী এসে ঘরের আলো জেলে, কাপড় ছেড়ে, হাত- মুখ ধুয়ে, দুজনে দু বাটি চা নিয়ে, খোলা জানালার সম্মুখে বসে গল্প আরম্ভ

কোরলুম। আমার মনে তখন ভয়-মাখান একটা আনন্দে ভরে উঠ্‌ল।

জিজ্ঞাসা কোরলুম—"ছবির বিয়ের কি হ'ল।"

"কি জানি; ঐ পর্য্যন্তই তো হ'য়ে আছে—"

"তুমি কি কোরে শুনলে?"

"আমি?—আমি।—ছবিই কি জানি কেন একদিন হঠাৎ বোলেছিল; তারপর অবশ্য আর কিছু বলে নি।" জিজ্ঞাসা করলুম—"তাঁকে বিয়ে করবার আপত্তিটা কি?"

"আপত্তিটা—যে কি ঠিক আমি ঠাউরে উঠতে পারলুম না। শুনেছি—বিজয়বাবু লোকটি মহা ধনী; ছবিদের বিষয় আশয় সমস্তই তাঁর কাছে বন্ধক। কিন্তু সে টাকা তিনি ফিরিয়ে চান না, তার বদলে চান—ছবিকে। ব্যাপারটা ঠিক কেনা-বেচার মত দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় এর ফাঁক দিয়েই প্রজাপতি উড়ে গেছেন।"

"তা, এর পূর্ব্বে আপত্তিটা প্রবল হয়নি কেন?"

"বোধ হয় বিয়ের তাগাদাটা একটু কম ছিল।" হয়ত ইন্দুর এই কারণটাই ছবির প্রবল আপত্তিটার পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত। জিজ্ঞাসা কোরলুম—"সুনীলবাবুর এখন মত কি?"

"তিনি ভগ্নীর মনটাকে বাদ দিয়ে, বিষয় ঠেকাবার দিকেই অধিক মনোযোগী। সেই কারণেই ছবির জেদও বেড়ে গেছে।" বলে ইন্দু স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার তখন—ইচ্ছে হচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করি শুধুই মানুষ মানুষকে মনের কথা বলে? আবার মনে হ'ল—যদিই বা সে বোলে থাকে, তাহলে তাতে ইন্দুর দোষ বা

হাত কি? ইন্দুর সৌভাগ্যকে—সৌভাগ্য কেন না সে একটী সুন্দরী তরুণীর বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছে—আমার খুব হিংসা হচ্ছিল!

সে রাত্রিতে কেউ আর কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না কোরে, আহারান্তে বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

ইন্দুর কখন যে ঘুম এসেছিল বলতে পারি না। আমি কিন্তু শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম—হঠাৎ ইন্দুকেই বা ছবি কেন বোলতে গেল সব কথা? আর বিজয়বাবুর সঙ্গে তার বিয়েতে বর্ত্তমানে আপত্তিটার যথার্থ কারণ কি? আমার জন্য? ইন্দুর প্রিয়-দর্শনতা ও সম্মানের চাকরীর কাছে, আমি তো কিছুই না। কিন্তু সে যদি ইন্দুকেই ভালবাসে, তাহলে তার কাছে কেনই বা বোলতে যাবে—এত কথা? মনের এই সব কথা বলবার অবস্থা তো তখন থাকে না। তবে কি? একি নিঃসহায়ের সহায় প্রার্থনা? যার কেউ নেই, সে কি এমন কোরে একজনকে আপন কোরে নিতে চায়? তবে ছবি—আমার সঙ্গে মন খুলে মিশেছিল কেন? আমায় ও ইন্দুকে সে যেন তার দুটি পাশে নিয়ে চলেছে, কার ভাগ্যে কান্না কার ভাগ্যে হাসি? কার প্রতি কটাক্ষ পাত করলে তার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা উপচে পড়তে চায়? কিছুই ত বুঝতে পারছি না। মানুষের—বিশেষতঃ নারীর, সুন্দরী তরুণীর মন এমন একটা দুর্ভেদ্য হেঁয়ালি; তার পক্ষে কোনটা সম্ভব আর কোনটা সম্ভব নয়, যা বুঝতে মানুষের কত বৎসর পরমায়ুর আবশ্যক কে জানে।

এমনি সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অনেক রাত্রে ঘুম এল। মনে হ'ল যেন, ইন্দুর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তখন শুন্‌তে পেলাম; কিন্তু হয়ত ভুল বোলে, সেদিকে কোন মনোযোগই দিলুম না।

(১৩)

তারপর প্রায় বারোটা দিন চলে গেছে। ইতিমধ্যে ইন্দু ও আমি দুজনে ছবিকে প্রকাশ্যে না হলেও, মনে মনে যেন একটা প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করে, জিতে নেবার চেষ্টা করে আস্‌ছি। কার হার আর কার জিত—ছবিই তা জানে, কার ক্ষুধিত অন্তরে সে তার প্রেমধারা অলক্ষ্যে সিঞ্চন করছে, সে বল্‌তে পারে। আমি ত তার আস্বাদন পাই না, ক্ষুধাই কেবল বেড়ে উঠছে।

যে বনে ছবিকে পাথর হেলান দিয়ে, একলা বসে থাক্‌তে দেখেছিলুম, সেই বনে ঠিক তেমনি সময়ে সেদিন একলাটি গেলুম। কিন্তু তাতে আজ আর সে মায়া যেন জড়িয়ে নেই।

দু এক পা এগিয়ে শুন্‌তে পেলুম, যেন ইন্দুর কণ্ঠস্বর, সে বল্‌ছে—"কি জানি, কেন যে এত দিন এখানে থেকে গেলাম বল্‌তে পারি না—"

"কালই চলে যাবেন?" বুকের ভেতরটা কেমন স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌ল। সারা শরীরের মাঝ দিয়ে রক্ত স্রোত অতি বেগে সমস্ত শিরায় শিরায় ছুটে গেল। আর একটু উদগ্রীব হয়ে শুন্‌তে লাগলুম।

ইন্দু বল্‌লে "তাতে কি কারুর ক্ষতি হবে ?"

"ক্ষতি—? না আপনার ত হবে না—"

"দেখুন, হয়ত আপনার কাছে—"

"আপনি আমায় 'তুমি' বোলে ডাকেন না কেন ?" কথার শব্দে মন রক্তার মুখের ভাব তাকে না দেখলেও অনেক সময় বুঝতে পারে। মনে হল কথা কয়টা বলেই যেন ছবি, ইন্দুর উত্তরটার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। তারা তখন সেই পাথরটার পাশে কি অবস্থায় রয়েছে, আমার দেখতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু সে উপায় ছিল না। তারা যদি আমায় একলাটি তাদেরই কাছে আড়ালে বসে থাকতে দেখে ত কি মনে কোরবে ? আমি ত তাদের কথা শুন্‌তে আসি নি !

"আচ্ছা,—'তুমি' বলেই যাবার সময় ডেকে যাই—" বোলে ইন্দু হাস্‌লে। ছবি কোন উত্তর দিলে না।

ইন্দু আবার বল্লে—"চল—তোমার দাদা হয়ত খুঁজবেন—"

"খুঁজুন গে—"

"না তা হয় না ;—চল—দাঁড়িও না এস—।" মনে হ'ল ইন্দু তার কাছে একটু সরে এল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে যেন ছবি বল্লে—"চলুন তবে—"

চল্‌তে চল্‌তে ইন্দু বল্লে—"আমায় তুমি কেন "আপনি বল—?" ছবির উত্তরটা শুন্‌তে পেলুম না।

তারা চলে গেল।

আমি তেমনি চুপ কোরে অসাড়ের মতন কতক্ষণ যেন বসে

ছিলুম! মনের ভাববার শক্তিটুকু অবধি তখন চলে গিয়েছিল। কেমন যেন সব ধোঁয়ার মতন চারিদিকে ছেয়ে ফেল্লে। মনে হ'ল সবই ধোঁয়া।

সেখান থেকে উঠে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এলুম।

সন্ধ্যায় ইন্দু আর আমি অল্প কিছুদূর বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। দুজনের মনই খুব গম্ভীর; দুই বন্ধুতে একই জনের কথা ভাবছি। কিন্তু সে চিন্তার ধারা, দুটি বিভিন্ন পথে সুখ দুঃখের বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

রাত্রে ইন্দু আমায় বোল্লে যে সে পরদিনই চলে যাবে। আমি এবার আর তাকে থাক্‌তে অনুরোধ কোরলুম না। আর কাউকে ধরে রাখতে চাইনে। ধরতে গিয়েই আজ অবধি ঠকে এলাম। এবার পারি তো ধরা দেব।

সকালে সে যাবার সময় শুধু বলে গেল "যদি আবার কখনও আসি তো বিরক্ত হবে না ত?"

তার পিঠ চাপড়ে বোল্লুম—"মনে রাখিস আমি তোর বন্ধু—" কথাগুলো একটু অস্বাভাবিক রকমের করুণ হয়ে গেল।

সে আমার হাতদুটো ধরে বল্লে—"সত্যি বন্ধু, তাই আজ বিদায় নিচ্ছি।"

এতদিন এক সঙ্গে দুটিতে ছিলাম, একই ব্যথা দুজনে পেয়েছি, যাবার বেলায়ও মনটা কি একটুও কাঁদবে না?

গাড়ীতে তাকে তুলে দিয়ে, বাড়ী এসে চুপ্ কোরে বসে রইলুম।

হঠাৎ দেখি সুনীলবাবু আমায় ডাকতে ডাক্‌তে ঘরে ঢুকেই বল্লেন "চলুন, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—"

"কোথায় ?"

"ঐ পাহাড়টার দিকে—।" সেই যেখানে ছবি আর আমি একদিন পাশাপাশি উঠে বসে ছিলুম। কিন্তু সে স্বপ্ন ত আজ আর লাগবে না। বল্লুম—

"কিন্তু রোদ্দুর—আপনি পারবেন ?"

"আমি পারব ; হয়ত ছবি পারবে না। অথচ ঐ-ই বোল্‌ছে আপনাকে নিয়ে বেড়িয়ে আস্‌তে—।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। কিন্তু সে ভাবটা দমন কোরে উত্তর কোরলুম—"বেশ ত—চলুন—" "তবে একটু বেলা পড়লে—।" এই সময়ে ছবি বারাণ্ডায় বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল। আমি বল্লুম—

"চলুন, আপনাদের বাড়ী যাই—"

"চলুন—"

দুজনে গেট দিয়ে বার হব, এমন সময় ডাক পিয়ন আমার হাতে একখানা চিঠি দিল। সেখানাকে খুল্‌তে না খুল্‌তে সুনীলবাবু একটু এগিয়ে গেলেন। আমি চিঠিখানা পড়ে স্তব্ধ হয়ে পড়লুম। মঞ্জী সেইদিনই বিকেলের গাড়ীতে আস্‌ছে, তার এক কোন্ আত্মীয়ের সঙ্গে কাশী থেকে ; আমায় ষ্টেশনে যেতে হবে !

সে কথা তাঁদের কাউকে জানালুম না ; শুধু বল্লুম—"আজ না গেলেই নয় ?"

ছবি বল্লে—"না—।" সুনীলবাবু তখন ভেতরে গেছেন।

"দেখ লক্ষ্মীটি—কাল যেয়ো—"

"আপনি ঐ রকমই করেন। যেতে চাইলে নিয়ে যান না। যান্—আমি যেতে চাইনে!"

একথা শুনে আমার মনের যত খেদ, যত ব্যথা সব নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ছবি আমার ওপর দাবী রাখে! যাকে ভালবাসা যায় তার দাবীটা কত মিষ্টি; সে কথা শুনেও কত সুখ? মনে হল—কথাই যেন সব!

বল্লুম—"রাগ কোরো না; একজন আজ সন্ধ্যের গাড়ীতে আস্‌বে, তাকে আন্‌তে যেতে হবে—"

"কে আগে বলুন—"

আমি যে কি উত্তর দেব বুঝে উঠ্‌তে পারছিলুম না। ছবি নিজে থেকেই বল্লে—

"না কারুর কিছু শুন্‌তে চাইনে—কিন্তু কাল যাবেন ত?"

"হাঁ—"

ছবির কথাগুলি একদিক দিয়ে আমায় একটা দায় হতে অব্যাহতি দিলেও, আর এক দিক দিয়ে মনে একটু আঘাত দিলে। জান্‌তে চেয়েও, আমায় দ্বিধার ফেরে ফেলেও কেন সে ছেড়ে দিলে? তার দাবীটাকে কেন ছিনিয়ে নিলে না!

সুনীলবাবু এসে আমায় জিজ্ঞাসা কোরলেন—

"তাহলে কি ঠিক হল?"

ছবি বল্লে—"উনি—আজ আর যাওয়া হল না—"

"বেশ—সেই ভাল।"

আমিও আর সেখানে অপেক্ষা না কোরে বাড়ী এসে যেখানে যেখানে জঞ্জাল ছিল, চাকরকে দিয়ে সব পরিষ্কার করাতে আরম্ভ কোরে দিলুম।

(১৪)

শেষ বেলায় মঞ্জীকে নিয়ে বাড়ীর ফটকের ভেতর ঢুকচি, এমন সময়ে দেখি ছবি সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েচে। সে আড় চোখে চোখে আমাদের দেখে চলে গেল।

মঞ্জী বাগানে ঢুকেই বোল্লে—"বাঃ কি চমৎকার। এত ফুল?" আমি কোন উত্তর দিলুম না। সে বাড়ীর বারান্দায় উঠে বোল্লে—"—এটা একেবারে নতুন বাড়ী। তবে যে তখন লিখেছিলে মেরামৎ দরকার!" আমি ধরা পড়ে গেলুম। কিন্তু দুরন্ত চোরের স্বভাব এই যে সে দোষ স্বীকার করে না। বল্লুম—"নতুনের মত কোরেই সারিয়েছি।" সে আর কোন কথা না বোলে, ভেতরে চলে গেল।

তারপর বাড়ীর এটা, ওটা, সেটা দেখে শুনে আমার কাছ থেকে তোরঙ্গ, বাক্স, আলমারীর চাবী নিয়ে পূরা মাত্রায় গৃহিণীপনা সুরু করে দিলে। আমি একদিক দিয়ে বাঁচলুম; কিন্তু আর একদিককার বিরক্তি বেড়ে গেল। সে আমার কাছে দুরন্ত ছেলের পড়া মুখস্থের মতন ঠেক্‌ল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে, আমি ঘুমোবার চেষ্টা কোরচি। সে কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না।

বোল্লে—"গল্প কর না!"

আমি কোন উত্তর দিলুম না, পাশ ফিরে শুয়ে রইলুম। সে আবার বল্লে—

"চুপ কোরে রয়েছ কেন!"

আমার রাগ হ'ল, তবুও স্বরটাকে যথাসম্ভব নরম কোরে বোল্লুম—"কাল সারা রাত ঘুম হয়নি, আজ না ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে।"

"এই ত সবে এগারোটা; একটু গল্প কর না।"

—"আমি এখন পারচি না।"

—"আমার ওপর রাগ কোরেচ!"

—"রাগ কোরব কেন!" স্বরে আমার এতটুকু রস ছিল না; যেন 'সিমুন'। সে কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বোল্লে—"সত্যি বলচো!"

—"হুঁ—।"

—"না, তুমি রাগ করেচ!"

—"তবে আর জিজ্ঞাসা কোরচ কেন!" সে কাঁদতে সুরু কোরে দিলে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে, ভেতরের বারান্দায় একটা Easy Chair এ গিয়ে বসে পড়লুম।

তখন টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি পড়চে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েচি জানিনে। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল।

আকাশ তখন মেঘনির্মুক্ত শান্ত সজল ও জ্যোৎস্নাভরা, গাছের পাতায় পাতায় বরষা-ত্যক্ত বৃষ্টির ফোঁটা চাঁদের আলোয় মাণিকের মতন জ্বলচে। অবিশ্রান্ত ভেক নিনাদ, ঝিল্লী স্বরে নিশীথের বিজনতা আরও নিবিড়তর কোরে তুলছে। দেখলুম অনন্ত আকাশ সাগরে চাঁদ যেন যুগ যুগান্তের পথে তরী ভাসিয়ে একলাটি কেবলই চলেছে। চারিদিকের এই গভীর সুপ্তি ও চেতনায় আমার মন মিলিয়ে গেল। খুব ধীরে ধীরে বহুদূর থেকে, একটা বড় আকুল কান্নায় মনটা ভরে গেল।

বর্ষার সিক্ত বনের ওপর দিয়ে যেন কার ব্যথিত গভীর নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মনে হল, এ বুঝি মঞ্জীর ব্যথিত হৃদয়ের চাপা কান্না। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর ঢুকে, মঞ্জীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। তার চোখের কোলে তখনও জল লেগে, জানালা দিয়ে তার সন্ত ঘুমন্ত মুখের ওপর জ্যোস্না ঝরে পড়চে। মঞ্জীকে তখন বড় সুন্দর লাগল। পুরুষের কাছে নারী মাত্রেরই কোন না কোন সময়ে রূপ আছে। ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত রেখে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলুম—"মণি।"

সে চোখ মেলে চাইলে। আবার ডাকলুম "মণি"। সে বরষার সিক্ত আকাশের মতন খুব শান্ত হাসি হেসে, আমার হাত দুটো তার বুকের ওপর চেপে ধরে বল্লে—

"সত্যি, তুমি রাগ কোরেচ!"

"না—গো—না—," !

"তবে তখন অমন কোরলে কেন!"

"তোমার সঙ্গে দুষ্টুমী কোরেছিলুম।"

সে বল্লে "কিন্তু কেমন জব্দ!" আমি হেসে ফেল্‌লুম; মঞ্জী তখন আমার কাছে নন্দন ঝরা পারিজাত।

* * * *

ভোরে মঞ্জীর ঘুম ভাঙ্‌বার আগেই আমি উঠে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লুম। মনটা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন "হা হা" কোরতে লাগল। একটা যেন নূতন বাঁধন গত রজনীতে মঞ্জী আমার পায় পরিয়ে দিয়েছে। যেন জগতের সৌন্দর্য্য রাশিকে পান করবার দুয়ারখানি, সে চিরদিনের মত রুদ্ধ কোরে দিয়েছে। আমাকে জীবনের শেষ পৈঠাটি অবধি তাকে বোঝার মতন, বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। রজনীর ঘুমন্ত জ্যোস্নায় আঁধার ঘরে যাকে সুন্দর দেখেছিলুম, দিবসের তন্দ্রা জড়িত প্রথম আলোক উন্মেষে, যেন তার সব সুষমাটুকু স্বপ্নের মতন উড়ে গেল। শুধু পড়ে রইল, তাকে ঘিরে আমাকে জড়িয়ে একটা কঠিন বাস্তব। মঞ্জীর কোথায়ও এক তিলও সৌন্দর্য্য নেই।

হায়, কুরূপ যা তাই আমার কপালে জুট্‌ল! পাহাড়ের চূড়ার আড়াল থেকে চাঁদ যেমন নিঃশব্দে আকাশে আলোয় ভেসে উঠে, ছবিও তেমনি কোরে আমার মনের অন্ধকারে হঠাৎ ফুটে উঠ্‌ল। কিন্তু সে যেন দূর আকাশের আকুল আহ্বান; তা শুধু ধরার বুকে বসেই শুন্‌তে হবে। মাটির বাঁধন কেটে উড়ে যাবারও উপায় নেই! ছবি আমার জীবনে শুধু ছবি হয়েই রইল। তাকে ত আর সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করা হবে না!

অন্যমনস্কের মতন চল্‌তে চল্‌তে সেই ঝিলের ধারে এসে, চুপ কোরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। সোনার আলোয় তখন চারিদিক ভরে গেছে; পৃথিবীর সব অন্ধকার তখন আমার মনের ভেতর সঙ্কুচিত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ী ফিরলুম। দেখলুম মঞ্জী বাইরে দাঁড়িয়ে, চাকরটাকে কি একটা বোঝাবার ব্যর্থ প্রয়াস কোরচে। চাকরটা হাঁ কোরে, তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

মঞ্জীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি—?"

"তুমি কোথায় গেছ তাই জিজ্ঞাসা কোরছিলুম।"

"কেন!"

"চা-টা খাবে না—!"

"হুঁ—।" বোলে আমি ঘরের ভেতর চলে গেলুম। মঞ্জী তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে।

আমি ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলুম, সে ছবিদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে যেন কি দেখচে। ছবিদের বাড়ীর দিককার ঘরে গিয়ে, জানালার ভেতর দিয়ে দেখলুম, ছবি বারান্দায় পায়চারি কোরতে কোরতে একটা বই পড়চে! মনটা লাফিয়ে উঠ্‌ল। সব দুঃখ ভেসে গেল, নির্লজ্জের মতন মঞ্জীর সমুখ দিয়ে ছবিদের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'তেই সে বল্লে—"উনি কে এসেছেন?"

আমার বাড়ীর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলুম; মঞ্জীকে দেখ্‌তে পেলুম না। সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে, ছবিকে জিজ্ঞাসা কোরলুম—

"কি বই ওটা ?"

"Thais ;—পড়েছেন ?

"হুঁ—; কেমন লাগচে ?"

"খুব ভাল"—একটু হেসে সে আবার বল্লে, "জগতের শ্রী সৌন্দর্য্যে নারীর প্রকাশ।"

"সত্যি, খুব সত্যি সেটা। বিশ্বকবির শ্রেষ্ঠ রচনা নারী। কিন্তু বইটার শেষ কলিটা বাদ দিলে, এক রকম দাঁড়াত।"

"আমার ত বেশ লাগচে।"

"সৌন্দর্য্যের কাছে সৌন্দর্য্য ধরা দিচ্ছে।" ছবির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল ; সে বইটা বন্ধ কোরে ফেললে। একটু কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে—

"—যান্ ; কি যে বলেন তার"—তার কথাগুলো ঠোঁটের সঙ্গে মিলিয়ে গেল ; রাঙা পাতলা ঠোঁটদুখানি শুধু নড়তে নড়তে সহসা থেমে গেল। বল্লুম—

"যদি দোষ হয়ে থাকে—।"

"আবার—?"

"আচ্ছা আর না ; অন্য কথা বল।"

"আপনার সঙ্গে এসেছেন উনি কে বলুন না ?"

আমার সঙ্গের ঐ মানুষটি কে, তার জানবার কৌতূহল দমন কোরতে আমায় তখনকার মত মিথ্যা ছলনা আর করতে হলনা।

ঠিক তখনই আমার চাকরটা এসে ডাকলে—"বাবু, মা ডাকছেন।"

আমি একটু অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখিয়ে বলুম "যাচ্ছি—।"

কিন্তু ছবির চোখ মুখের চেহারা দেখে মনে হল, যে সে এই নারীটির সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা যেন ধরে ফেল্লে। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে বোল্লে—"আবার আসবেন ত?"

"হুঁ—।" বোলে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলুম।

বাড়ী আসতেই মঞ্জী বোল্লে—"সব যে ঠাণ্ডা হোয়ে গেল, কখন খাবে?

"দাও—।" বোলে আমি চেয়ারে একটা টেবিলের সম্মুখে বস্‌লুম। সে খাবার এনে দিলে; আমি নীরবে খেতে লাগলুম।

সে বোল্লে—"ও কে গো?"

"কৈ?"

"যার সঙ্গে বোসে তুমি কথা বোলছিলে? খুব সুন্দর দেখতে ত।"

"হুঁ—।"

"ও কে—?"

তাইত ও কে? কি বোলে এখন পরিচয়টা দিই? বল্লুম—"আমাদের প্রতিবেশী।"

"আমি আলাপ কোরব?"

"কি হবে?"

"দুজনে বেশ গল্প কোরব। বল না, আজ ওদের বাড়ী বেড়াতে যাব?"

"তোমার ইচ্ছে—।"

"না—বল না—।"

"বল্লুম ত—। তোমার ইচ্ছে।"

"তবে যাব না।" আমি চুপ কোরে রইলুম ; খাওয়া শেষ হলে, উঠে বাইরের বারান্দায় একটা এসে বস্‌লুম। সে ভেতরে চলে গেল।

নিজের ওপর ঘৃণা হল ; আমি এ কি লুকোচুরি খেল্‌চি ;—যে দুঃখ ও বাঁধন নিজের হাতে বরণ কোরে নিইচি, তাকে ত আর কোন মতেই দূর করা যাবে না। আমার নিয়তি আমায় যে ভাবে গড়েছেন, তা ভেঙে হয়ত আর কেউ হলে নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢেলে গড়ে নিতে পারত। কিন্তু আমার সে সামর্থ্য আদৌ নেই ; তার কারণ, আমার ভাগ্যদেবী আমার হাতে সেটুকু শক্তিও তুলে দেন নি। মঞ্জীকে নিয়ে আমার রূপের ক্ষুধা না মিট্‌তে পারে, কিন্তু তাই বোলে, তাকে ঠেলে ফেল্‌বার অধিকার আমার নেই। সে যে আমায় ভালবাসে ; এত বড় পৃথিবীর ভেতর অন্ততঃ একজনও যে আমায় তার হৃদয় বিলিয়ে দিয়েচে। সে রূপহীনা সত্যি ; কিন্তু সুন্দরী ও কুরূপার প্রেমে ত পার্থক্য নেই। আর আমি নিজে কি নিয়ে হাটের মাঝে পসরা সাজিয়ে বসেচি ? আমার হৃদয়কে অবহেলা ভরে ঠেলে ফেল্‌বারও অধিকার ত সবারই আছে। যা পেয়েচি তা অনেক। আমি নিতে জানি নে, কাউকে কিছু দিতে পারি নে, তাই বুক ভরা অতৃপ্তির আকুল কান্না বয়ে বেড়াই। মঞ্জী—মঞ্জীই আমার মতন ভিখারীর কাছে সোনার টুক্‌রো। মঞ্জী ঠিক সেই সময়ে আমার কাছে এসে বাক্সের চাবী

চাইলে ; আমি একদৃষ্টে তার সারা দেহের ভেতর সৌন্দর্য্যের সন্ধান কোরতে লাগলুম। মানুষের জীবনে আহারের মতন সৌন্দর্য্যও বড় দরকারী ; তাকে দূরে সরিয়ে আজ অবধি কেউ বাঁচতে পারে নি এবং পারবেও না। আবার ভাল না বাসলে সৌন্দর্য্যকে কেউ চিনতে পারে না। মঞ্জীর দেহের ভেতর থেকে আমি কিছুই পেলাম না! গত রজনীর ছবিখানা হঠাৎ মনের ভেতর ভেসে উঠ্‌ল। তখন তাকে যেমন কোরে দেখেছিলাম, তাকি তার নিজের রূপ নয়? অপ্সরীর শিথিল অঞ্চল থেকে সেটুকু সৌন্দর্য্য তার মুখে, বুকে, সারা দেহে ঝরে পড়েছিল? তাকি মর্ত্ত্যের হাওয়ায় মলিন হয়ে, ফুলের মতন শুকিয়ে গেল? সে তখনও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু অবাক্ হয়ে। আমার ভাব গতিক দেখে বোল্লে—"কি দেখচ অমন কোরে?"

চট্ কোরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"তোমাকে!"

"আমার ভেতর ত দেখ্‌বার নেই কিছু।"

কথাটা খুব সত্যি ; কিন্তু তার উত্তর দেব কি? সে ধীর স্বরে যে কথা কয়টা বোল্‌লে, তা বড় করুণ। মঞ্জীর রূপহীনতা তার প্রাণেও যে করুণ কাকলী তুল্‌চে, তা আমি সেই প্রথম শুন্‌লুম ; মনটা কেঁদে উঠল। আমার মনের সব বাধা ঠেলে, এমন একটা ভাব আমার চোখে মুখে কোথা থেকে যেন ফুটে উঠল, আমি এমনভাবে তার মুখের দিকে চাইলুম, এমন হাসি হাসলুম যাতে প্রকাশ পেল—"তোমায় আমি ভালবাসি।" সে আমার মনের কথাটি বুঝে যেন খুব একটা সান্ত্বনা পেলে ; একটা সুখের হাসি

হেসে, চাবি নিয়ে চলে গেল। সে ঘোর কিন্তু সহসা কেটে গিয়ে আবার আমার মন বেঁকে দাঁড়াল; আবার নিরুপায়ের মতন অতৃপ্তির কান্না!

*　　　*　　　*　　　*

দিন দিন আমার নিজের ওপর থেকে একটা শক্তি আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগ্‌ল! কখন কি ভাবি তা বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। মনের ভেতর একটা লড়াই সুরু হ'য়ে গেছে। মনটা নদীর মত দ্বিধারা হয়ে একটা মঞ্জীর দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা কোর্‌তে লাগ্‌ল, আর একটা তাতে সাধ্য মতন বাধা দিতে সুরু কোরে দিল। ছবির চেয়ে মঞ্জীর কথাই, সারাদিনরাত মনের সবখানে ঘোরা-ফেরা আরম্ভ কোরলে। যদি এমন ভাব কাউকে অবিশ্রান্ত আঘাত করে, তাহলে তার বাঁচা দায়; মানুষ যদি মানুষের মনটাকে দেখ্‌তে পেত, তা'হলে তার পৃথিবীতে থাকা দায় হত যে। ভাগ্যিস্‌ কেউ কারো মনটাকে দেখতে পায় না। ছবি!—আমার জীবনের মলিন পাতায় তার যে রেখাটুকু ফুটে উঠেচে ধীরে ধীরে, তা সত্যিই মুছে যাবে? যৌবনের আকুলতা শূন্য মনে হা হা কোরে নিশিদিন শুধু কেঁদে বেড়াবে?

যে বলে, দেহের সৌন্দর্য্য মিছে, সে হয় নির্ব্বোধ, নয় মিথ্যাবাদী। অসীম সৌন্দর্য্য অফুরন্ত রেখাবৈচিত্রে, সংখ্যা-হারা পথে অনন্তকাল ফুট্‌তে ফুট্‌তে চলেচে। আর তার সুমুখে দেহ মন সারা হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলী হাতে নিয়ে সুরে, রেখায়, কথায় তার

যথাযোগ্য মন্ত্র রচনা কোরচে ; সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যে মিশিয়ে যাচ্ছে ! ঊষা ও সন্ধ্যার অপূর্ব্ব মিলন।

দূরে, পাহাড় চূড়ে তখন সন্ধ্যা নেমেচে। সবেমাত্র দিনের চঞ্চল রথচক্রের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর ধ্বনি স্তিমিত আলোর মতন শূন্যে মিলিয়ে গেচে, সবে মাত্র পাখীর কলকাকলী তাদের শ্রান্ত কণ্ঠে ঘুমিয়ে পড়েছে, লক্ষ ঝিল্লীর অযুত বীণা ঝিম্ ঝিম্ কোরে আসন্ন রাত্রির অনন্ত সুরের সাথে সুর মিলিয়ে দিতে সুরু করেছে ; আমি চলেছিই। মঞ্জী আমার ঢের পেছনে রয়ে গেচে, এ আমি জানতে পারিনি। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখ্‌লাম, কিছু দূরে সে আর ছবি গল্প কোরতে কোরতে আসচে। বুকটা যেন কিসের আশঙ্কায় সহসা কেঁপে উঠল। ছবি আমায় ফিরতে দেখে, হাত ছানিতে ডাক্‌লে। আমি এগিয়ে তাদের কাছে গেলুম। ছবি বোল্লে—

—"বাবা ! আমরা কি কেড়ে নিতুম !"

—"কি ?"

—"যে তাই বলা হল না ইনি কে !" আমি একটু হাসলুম।

সে বোল্লে—"এখন সাহস হচ্ছে ত ?"

মঞ্জী বোল্লে—"কেড়ে নেবার কিই বা আছে ?"

ছবি বল্লে—"শুধু তোমার মনটাই ত অনেক !"

আমি—"কিসের চেয়ে—!"

মঞ্জী—"ছাই—!"

আমি—"ছাইয়ের চেয়ে—?"

ছবি গম্ভীর, মঞ্জী শান্ত এবং আমি কিছু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম, কথাটা বোলে। আমরা তিনজন একসঙ্গে চলতে লাগলুম। মনে হল রাত্রির ছায়াখানি যেন হাত বাড়িয়ে, আমাদেরও মনের আলোটা নিবিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে ছবি বোল্লে—"কাল থেকে যখন তখন আমাদের বাড়ী আস্‌বে ভাই?"

"হ্যাঁ, সময় পেলেই যাব; আর তুমি?"

আমার দিকে ফিরে ছবি বোল্লে—"আপনার তাতে ক্ষতি হবে না ত?"

"হলেই বা কি কোর্‌চি?"

"না, কারুর ক্ষতি কোরে কিছু চাইনে—।"

"ক্ষতি—হলেই কি ছাড়ি?" ছবি আমার মুখের দিকে তাকালে, মঞ্জী তেমনি শান্ত। আমি মঞ্জীর সমুখেই তাকে আঘাত সুরু কোরে দিলুম।

(১৫)

ছবিকে তার বাড়ীর দরজায় রেখে, মঞ্জী আর আমি বাড়ী এলাম। মঞ্জী ঘরে না ঢুকে বাইরে ফুল বাগানে, একটা পাথরের বেঞ্চির ওপরে বোসে বোল্লে—"উঃ কি গরম!" আমিও সেই বেঞ্চিটার একপাশে তার কাছ হতে, কিছু দূরে গিয়ে বসলুম। সে আস্তে আস্তে বেঞ্চিটার ওপর শুয়ে পড়ল।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ঘুম পাচ্ছে—?"

"উঁহুঃ—।"

"খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?"

"হুঁ"—

"কাল থেকে আর অতদূরে বেড়ান হবে না।"

সে চুপ কোরে রইল; একটু পরে বোল্লে—"আচ্ছা, ওর সঙ্গে তোমার কি কোরে ভাব হল?"

"এমনিই পথের আলাপ।"

"ছেলে মেয়ের সঙ্গে শুধু শুধু পথের আলাপ হয়?"

"তা না হলে, এটা হ'ল কি কোরে?"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরব, বল্‌বে?"

"কি?"

"তুমি ওকে খুব ভালবাস—না?" এতখানির জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ছবিকে আমি ভালবাসি—হাঁ, ভালবাসিই। কিন্তু এ সত্যটা প্রকাশ করবার মত দুঃসাহস আমার কি যানি কেন হলনা। আমি নিরুত্তর হয়ে রইলুম। সে আবার বল্লে—"আচ্ছা, সত্যি কোরে বল না? তাতে আমার একটুও দুঃখ হবে না?"

"কেন?"

"ওকে যে দেখবে, সেই ভালবাস্‌বে। এটা খুব স্বাভাবিক; আর সত্যিই ত আমার মধ্যে ভালবাসবার মত কি-ই বা আছে?"

ছবির সেই কথাটা মনে হল "মনটা।" মঞ্জীর মনটাকে আমি এতদিন অবহেলা কোরেছিলুম; আজ টের পেলুম মঞ্জীরও সৌন্দর্য্য আছে। তার মনে সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ঝরণা মৃদুতানে দুকূল ভরপূর কোরে বয়ে চলেচে। মঞ্জী পিয়াসীর জল, শ্রান্তের সুশীতল

তরুছায়া। আর ছবি নব প্রভাতের প্রথম জ্যোতিরেখা, স্তিমিত দিনান্তের কোলে নীলাকাশের প্রথম তারা ; বরষার মেঘভারাতুর আকাশের মাঝে প্রথম বিদ্যুৎ লেখাখানি।

মঞ্জী বল্‌লে—"তুমি আমায় এতদিন বলনি, এবার আমি টের পেয়েচি। যাই বাবা—এখনও অনেক কাজ বাকী—।" বলেই সে উঠে গেল। আমি একলা চুপ কোরে সেখানে বোসে রইলুম।

মঞ্জী আপনাকে একটা ঔদাসিন্যের আবরণে ঢেকে যে কথাগুলো আমায় বলে গেল, তার পেছনে তার ব্যথিত হৃদয়খানা বেরিয়ে এসেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল কিনা জানি না যে, আমি তার মনের ভাবটাকে জান্‌তে পেরেছি।

তার সকল কাজ ও কথার ভেতর দিয়ে আমি বেশ বুঝতে পারতুম যে, সে আমার সুখটুকু সব সময়েই চায়। তার জন্যে সে যে কোনো গভীর দুঃখ সইতেই যেন রাজী ছিল। কিন্তু আমার মনটা তার এতটা ত্যাগকে আশ্রয় কোরে, কোন সুখ বা আনন্দ গ্রহণ কোরতে, সব সময়ে চাইত না। তার কাছে আমি যা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, তা সে বুঝ্‌তে পেরেছে ; ছবির কাছে মঞ্জীর পরিচয়টাও আমি দিতে চাইনি, কিন্তু ছবিও তার পরিচয় পেয়েছে। মঞ্জীর কাছে ধরা পড়ায় আমার মনটা বিশেষ রকম নুয়ে পড়েনি ; কিন্তু ছবি আমার লুকোচুরিটা যে আপনা থেকে ধরে ফেলেছে, এইটেই আমার একটা দারুণ লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত হৃদয়টা আমার কেমন একটা বিশ্রী ভাবে ভরে গেল। নিজের সেই লুকোচুরিটার কথা বার বার মনে হতে

লাগল, আর আমার সমস্ত চিত্ত যেন ঘৃণায় ভরে উঠল। তার কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ হতে লাগল। ছিঃ! আমি কত ছোট। জগতে আমার আসনটি নির্দ্দেশ করতে নিয়তি কিছুমাত্র ভুল করেন নি; তাঁর কাজে এতটুকু খুঁৎ নেই। আমার ভাগ্যে যা নেই বোলে, একটা প্রচণ্ড বাসনার জ্বালা বয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছি, এত ক্ষুদ্র যার চিত্ত, সে কখনো তা লাভ করতে পারে না। আমি যে তার উপযুক্তই নই।

আস্তে আস্তে আমার ঘরে উঠে গেলুম—ঘর অন্ধকার! মঞ্জী সে ঘরের মেঝেতে শুয়েছিল; আমার পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বললুম—"আলো নেই যে।"

"জ্বেলে আনচি, নিবে গেচে।"

মঞ্জী কাঁদছিল কিনা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু তার এ ভাবে এখানে শোয়াটা আমার কাছে কিছু অস্বাভাবিক বলে বোধ হল। তার মন যে একটা গভীর ব্যথায় ভরে উঠেছে, তা বুঝলুম। বল্লুম—

"আলো দরকার নেই।"

"অন্ধকার যে।"

"তা হোক।" আমার মনও কেমন করুণায় ভরে উঠল। আর লুকোচুরি খেলব না; সত্য কথাটা যা তা ব্যক্ত করে ফেলি। সরে গিয়ে তার কাছে মেঝের ওপর বসে, তাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বল্লুম—

"মণি, তোমায় আমি এত কাল ফাঁকি দিয়ে আসচি।"

সে তার মুখখানা আমার বুকের ভেতর রেখে, অসাড় হয়ে রইল। আমার বুকের ওপর দিয়ে তার চোখের তপ্তজল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তা মুছিয়ে দিয়ে বল্লুম—"মণি—।"

"কেন, তুমি আমার কাছে সব লুকিয়ে রাখ; আমি ত জানি আমার কিছুই নেই। তোমায় ছেড়ে দিতে—।" সে আর কিছু বোল্‌তে পার্‌লে না; কাঁদতে লাগ্‌ল। আমি চুপ কোরে বাইরের অগণিত চঞ্চল তারা ভরা নিস্তব্ধ আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইলুম। সে একটু পরে নিজেকে সাম্‌লে নিলে। কিন্তু আমায় দুহাতে খুব নিবিড় কোরে জড়িয়ে ধরলে। আমি তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম—"চল, আমরা এখান থেকে কিছুদিন আরও পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি।"

"না—"

"কেন?"

"কি হবে গিয়ে?"

"তবে চল বাংলায় ফিরে যাই।"

"কোথায়?"

"কোল্‌কাতায়।"

"না—"

"তবে কোথায়?"

"কোথায়ও না; এইখানেই থাক্‌ব।"

"থেকে কি লাভ?"

"অত আমি বুঝি না—।"

বাইরে থেকে চাকরটা হঠাৎ মঞ্জীকে "মাজি, মাজি" কোরে ডাকলে; সে উঠে গেল। আমি বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলুম, আমার বিচিত্র মনের কথা। জীবনের ভেতর যে অশান্তি এসে দাঁড়াল, তার জন্য দায়ী কে? আমি? রূপের নেশা আমায় ধরে বোসেছিল, না আমিই তাতে পাগল হয়ে উঠেছিলুম? রূপ চেয়ে কি দোষ কোরেছি? জীবনের মাঝে যাকে পেয়েছি—যাকে স্ত্রী বোলে গ্রহণ করেছি, যাকে পেয়ে আমার অতৃপ্ত মন একদিন তৃপ্তির প্লাবনে উপচে গেছে; যার জন্যে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে, তাদের বিদ্রূপ মাথায় নিয়ে দূর প্রবাসে বুকের রক্ত দিয়ে, এই গৃহখানি গড়ে তুলেছি, তাকেই আজ উপেক্ষা করতে হচ্চে! তাকে ফাঁকি দিয়ে, তার ভালবাসাটুকু গ্রহণ কোরে, কি কোরে এক সঙ্গে বাস করব? কিন্তু উপেক্ষা ও ফাঁকি এ দুটো যেন আমার স্বভাব, সে দুটোকে মন থেকে একেবারে তাড়াবার একটা দৃঢ় যত্ন আমি আজ অবধি কোরে আসচি; কিন্তু সফল হতে পারলুম না। আমি ঈশ্বর মানি না। হঠাৎ মন আমার আকাশে আকাশে উদ্ধশ্বাসে একটা বিরাট সহায়ের আশায় কেঁদে কেঁদে ছুট্‌তে লাগল। এ অন্ধকারে এতটুকু আলো, একখানি হাত যদি ধরতে পেতাম!

আমার চির শুষ্ক চোখ দুটোর পাতার কোলে কোলে, একটা অশ্রু উৎসের ছোট ঢেউ এসে ছড়িয়ে গেল। আমিও শেষকালে কাঁদ্‌লুম? ছবি, মনের কোণে একেবারে ঝাপ্‌সা হয়ে গেল; মঞ্জী ধীরে ধীরে তার ছায়া ছড়িয়ে মন জুড়ে রইল। মন একটা

মধুর গাম্ভীর্য্যে ভরপূর হয়ে গেল। চুপ্ কোরে বিছানায় পড়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে মঞ্জী এসে আমায় ডাকলে। "ঘুমুচ্ছ?"

"না—"

"তবে?"

"এমনিই শুয়ে আছি।"

"ওঠ, চল বাইরে যাই।"

"চল—।" বাইরে ফুলবাগানে সেই বেঞ্চির ওপর গিয়ে, আমি শুয়ে পড়লুম; সে আমার পাশে বসে রইল। চারিদিক অন্ধকার; মাথার ওপর তারাগুলি জ্বলছে।

কি যেন ভাবতে ভাবতে মঞ্জী বল্লে "আচ্ছা—না থাক্।"

"কি?"

"কিছু না—"

আমার কৌতূহল বেড়ে গেল; বল্লুম—"বোলতে হবে।"

"সত্যি, কিছু না।"

"না বোল্লে—।" বোলে আমি অভিমানের ভাণ কোরলুম; সে কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে, আমার মাথায় হাত দিয়ে বোল্লে—

"রাগ কোর্‌লে? আচ্ছা বল্‌চি।" আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। তারার স্তিমিত আলোকে দেখলুম, মঞ্জীর মুখে একটা যেন শ্রী জড়িয়ে আছে।

সে বল্লে—"তুমি রাগ কোর্‌বে না?"

"না—।"

"আচ্ছা—সত্যি বাড়ীটা তখন ভাঙ্গা ছিল? এইজন্যে কাশী গেলে না?" আমার মনটার ভেতর আর লুকোবার কিছু ছিল না এবং আর কিছু লুকাতে ইচ্ছেও ছিল না। বল্লুম—"না, সবই ত জান্‌তে পেরেছ?"

"তবে আমায় আন্‌লে কেন?"

"তোমার ভাগ তুমি ছেড়ে দিতে পার?"

"নিশ্চয়—। আমরা মেয়ে।"

"সেই জন্যেই আরও পার না। আমরা—পুরুষরা তা পারি।"

"হুঁ—তা বৈ কি?"

"তা না হলে, এত গুলো উপন্যাসের ক'খানায় তোমাদের ত্যাগের কথা আছে?"

"ও গুলো যে তোমরা লিখেচ।"

"তোমরা লিখ্‌লেও তাই হোত।"

"যাক্ গে—ও কথা। ছবিকে বিয়ে কর না!"

"তার উপায় নেই।"

"তবে বেশ ভাল দেখে আর একটা বিয়ে কর—।"

তার সুরটা যেন কেমন অভিমান ভরা, তাতে তার এতটুকু হাত নেই। এ অভিমান আমি হলেও কোরতুম; এবং আমার ভাগ্যের ওপর কোরেও থাকি।

সে রাতটা আমরা দুজনে দুজনকে যেন আবার নূতন কোরে ফিরিয়ে পেলুম; একটা নিবিড় সুখের ভেতর দিয়ে রাতটা কেটে গেল। স্বপ্নের কোলে স্বপ্ন উঠ্‌তে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

পরদিনের বেলা যায় যায়। মঞ্জী ছবিদের বাড়ীতে সারাটা দুপুর কাটিয়ে ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা কোরলুম—

"তোমার বেড়ান হ'ল?"

"হুঁ" বোলে ঘাড় নেড়ে আমার পাশে এসে বোসে সে জিজ্ঞাসা কোরলে—"হ্যাঁ গো, আমি আসবার আগে আর কেউ এখানে থাকত?" ইন্দু যে ছিল সে কথাটা অনাবশ্যক বোধে আমি তাকে বলিনি।

উত্তরে বোল্লুম—"হ্যাঁ; আমার এক বন্ধু ছিল ইন্দু বোলে। কেন বল ত?"

"তাঁর কথাই আজ শুনে এলুম। তিনি একদিন –"

"ছবিদের বাড়ীতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন—"

"কৈ সে কথা তো শুনলুম না। একদিন তোমাদের কি রকম ভুল কোরেছিলেন তাই শুনলুম—"

"হুঁ। তাই কি?"

"তাঁর কথাই শুধু ছবিদির মুখে শুনলুম। কখন বেড়াতেন, তুমি চলে গেলে কি কোরতেন একলাটি, এই সব কত কথা। তিনি আবার আসবেন?"

"কি জানি—ছবি বোল্লে?"

"হুঁ। আর আমার মনে হয়, ইন্দুবাবুকে ও খুব ভালবাসে।"

"তা আর আশ্চর্য্য কি! তার চেহারাটি বেশ।"

"কিন্তু ওদের বিয়ে হয় না কেন?"

"ওর বিয়ে ত আর একজনের সঙ্গে, ওর দাদা ঠিক কোরে রেখেছে—"

"আমার কিন্তু ইচ্ছে হয়, ওর সঙ্গে তোমার বেশ বিয়ে হোত! আর তোমাদের যে ছেলে হত, তাকে আমি বেশ মানুষ কোরতুম!"

আমি একটু দুষ্টুমি কোরে বল্লুম—"তবে আমার সম্বন্ধটা কর—"

"তা যদি হোত তো আমি কি আজ ছাড়তুম? উপায় যে নেই!" বোলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, সেখানে থেকে সে উঠে গেল। সে করুণ নিশ্বাসটুকু যেন আমার মর্মমূলে সজোরে একটা আঘাত দিলে। যাবার সময় তবুও বল্লুম—

"এই মন নিয়ে নিজের দাবী হাসি মুখে ছাড়তে চাও—?"

"ছাড়বার সময় হাসব তা সত্যি—কিন্তু তার পরে কি কোরব জানিনে—"

(১৬)

তারপর হতে মনে হল, মঞ্জী যেন তার সকল দাবী আমার ওপর থেকে অতি সন্তর্পণে সরিয়ে নিচ্ছে। তার শ্রীহীন দেহখানার যথাসম্ভব অবহেলা ও অযত্ন কোরে সেটাকে সে আরও কুৎসিত করে তুল্‌ছে।

মনে মনে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করে একদিন বল্লুম—

"মণি, দাবীটা এমন ভাবে জড়ানো থাকে যে, তাকে তুল্‌তে গেলেই, তা ওঠে না। তা হলে, আজ এত ভাবনার কারণ ছিল না ত।"

সে বল্লে—"তা জানি বলেই ত জোর করে, সেটাকে তুলে নিতে চাই।"

তার মুখে এমন উত্তর পাবার আশা করি নি। মানুষ বোধ করি মনে মনে অতিমাত্রায় ব্যথিত হয়ে উঠ্‌লে, এমন মুখর হয়ে উঠ্‌তে পারে।

বল্লুম—"আর তুলে নিলেই কি তা সত্যই নেওয়া যায়? তা ছাড়া দেহটাকে নষ্ট করেই বা লাভ কি?"

"লাভ? যা কুৎসিত তার যত্নই বা কেন?" বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! বুঝ্‌লুম, যে অভিমানটা এতদিন তার মনের এক কোণে দেখা দিয়েছিল, সহসা আজ তা এমন রূপে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে যে, তার পরিণামে অমৃতের বদলে উঠ্‌বে বিষ। অবশ্য এর জন্য দায়ী আমারই মন। সংসারে মনের দাবী-দাওয়া যদি অল্প কয়েকটি সামগ্রীতেই সীমাবদ্ধ থাক্‌ত, তাহলে বোধ করি, এত ঝঞ্ঝাট মানুষের জীবনে দেখা দিত না। অনেক চাওয়ার হাঙ্গামাটা যে অনেক। কিন্তু মঞ্জী হঠাৎ যে এমন পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে, এ ধারণাটা আমার ছিল না। যাই হোক্, তার আসন থেকে তাকে সরিয়ে, আর কাউকে সেখানে বসাব না, এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। আর সেটা পালনে যে আমার চেষ্টা প্রভূত, মঞ্জীর ঠাঁইটুকুতে যে আর কারো অধিকার নেই,

এ কথাটা তাকে আমি নানান্ ছলে বোঝাতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু মনে হল, সে যা বুঝেছে, তার ভুল ধরায় সংসারে এমন কেউ নেই।

পরদিন ছবিদের যাবার দিন। সন্ধ্যার কাছাকাছি আমাদের বাড়ীতে সুনীল বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সে দেখা করতে এল। সুনীল বাবু দুই চারটি কথা বলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে গেলেন; ছবি মঞ্জীকে নিয়ে শেষদিন একবার বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছা জানালে। কিন্তু মঞ্জী অসুখের অজুহাতে বাড়ীতেই রয়ে গেল। বল্লে—

"বেড়াবার সঙ্গী ত হাজির; ওঁকে নিয়েই যাও ভাই।"

ছবি বল্লে—"একলা ছেড়ে দিচ্ছ কিন্তু—"

"যদি নিতে পার ত বেঁচে যাই।" বলে মঞ্জী যেন পরম কৌতুক ভরে হাস্‌লে।

"তবে চলুন—" বলে ছবি আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে দুজনে পড়লুম।

সেদিন বোধহয় শুক্লা একাদশী। গাছের ডালগুলি ফাঁক করে জ্যোৎস্না পড়েছে চারিদিকে। পথের পাশে রামতুলসী, চামেলি ও শিউলি ফুলের একটা মিশ্র সৌরভ বাতাসটাকে যেন মাতাল কোরে তুলেছে। ঝিল্লী ঝঙ্কারে মনে হচ্ছে, রজনী যেন তৃণের বনে নুপুর পায়ে চলে চলে যাচ্ছে।

আমরা দুজনে পাশাপাশি চলেছি। ছবি আমার এত কাছে; যেন তার গায়ের একটু স্পর্শ ও সৌরভ আমি অনুভব করলুম। আমার মন মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

হঠাৎ খাপ ছাড়া ভাবে ডেকে বসলুম—"ছবি?"

সে তার কোন উত্তর না দিয়ে, শুধু মুখখানা আমার দিকে ফেরালে। খানিকটা জ্যোৎস্না তার মুখে লেপে গেল।

বল্লুম—"পথের আলাপী এই লোকটাকে মনে থাকবে?" সে উত্তরে একটু হাসলে। তারপর বল্লে—

"আপনি বুঝি মানুষকে তাড়াতাড়ি ভুলে যান?"

ভুলে যাই? না, না, না, অন্ততঃ তাকে ত না। বল্লুম—"ভাল না বাসলে কাউকে মনে থাকে না।"

"থাকে না? সম্ভব তাই।"

সামনেই পথের পাশে দেখলুম, একগোছা চামেলী ফুল ফুটে, জ্যোৎস্নায় হেসে সারা হচ্ছে। স্তবকটাকে ত্রস্তে ছিঁড়তে গিয়ে, দু একটা ফুল ঝরে মাটিতে পড়ে গেল। বাকীগুলিকে গোছা ধরে এনে, তার ডান হাতখানা ধরে তুলে সেটাকে দিতে যেতেই, সে হাতখানা নিমেষে সরিয়ে নিলে। স্তবকটা পথের ধূলায় পড়ে গেল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম; তার সৌন্দর্য্য ও সুষমাই আমার কাঙাল দৃষ্টিকে মুগ্ধ করলে। তার মনের ভাবটাকে অনুভব করবার তখন ইচ্ছাই হল না, বল্লুম—"ছবি, ভালবাসার এ দান প্রত্যাখ্যান করলে? এর বেশী আরত কিছু চাই নি। আমি যে তোমায় ভালবাসি, এই কথাটাই যাবার বেলা বোঝাতে চেয়েছিলুম।"

আমার কথাগুলো তার কানে পৌঁছল কি না জানি না, দেখলুম তার চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠেছে। অশ্রু সজল

চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বল্লে—"এতখানির দরকার ছিল কি? চলুন, চলুন, ফিরে চলুন।" তারপর চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে বল্লে—"এতদূরে এসে পড়েছি। যদি জানতুম!"

"কি জান্‌তে? আমি তোমায় ভালবাসি? অন্যায় কিছু করি নি; রূপ চেয়ে এতটুকু দোষ করিনি। তুমি আমার জীবনের সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে গেছ, রূপের নেশা যে ভাবে আমার মন ছেয়ে আছে, তা যদি জান্‌তে! কিন্তু অচেতন সৌন্দর্য্য, সে কি জানে, মানুষের অন্তরে কি তৃষ্ণা জেগে আছে? চল, ফিরেই চল।" ফুলের স্তবকটা তেমনি ধূলায় পড়ে রইল; আমরা গৃহে ফিরে চললুম।

তখনকার মনের অবস্থা আমার কেমন হয়ে গেল, বুঝতেই পারলুম না। মেঘ-জ্যোৎস্না, বর্ষা-বসন্ত সারা মন ছেয়ে আলো-ছায়ায়, গন্ধে-গানে সে কি সুর বাজিয়ে দিলে। একটা নারীকে এভাবে নিভৃতে আমার পক্ষে প্রেম নিবেদন যে, দারুণ দুর্নীতির পরিচায়ক তা মনেই জাগল না। মন যে প্রিয়াকে তার সকল কথা কইতে পারলে না, সে স্বপ্নময়ীরাতি এসে বৃথা ফিরে গেল, এই খেদেই সে গুমরে মরতে লাগল।

চলতে চলতে একবার পিছনে ফিরে তাকালুম। ঝিলের বুকে জ্যোৎস্না যেন একবার ঝল মল করে উঠেই সহসা নিভে গেল।

ঘরে ফিরলে মঞ্জী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল অন্তরের তল অবধি দেখে নিলে। কিন্তু কিছু বল্লে না। রাত্রিতে একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলে—

"ছবিদি কাল ভোরেই যাবে ?"

"হুঁ।"

সে যামিনী বোধ করি উভয়েরই বিনিদ্র কেটে গেল।

(১৭)

যেটাকে কেন্দ্র করে আমার মন এতকাল ঘুরে ঘুরে মরছিল, তা কোথায় যে সরে গেল তার দিশা পেলাম না, তবু তার ঘোরার আর শেষ হল না। ছবি চলে গেছে, তার গৃহদ্বার শূন্য। সেই শূন্য স্থানটুকুর চারি পাশে সে কেবলই গুন্ গুন্ কোরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মঞ্জীর দিকে ফিরে তাকাবার অবসর তার যেন নেই।

তারপর অনেকগুলি দিন এমনি কোরে কেটে গেল। সহসা একদিন দৃষ্টিটা আমার বেন অতি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠ্ল। দেখলুম মঞ্জীর মুখখানি ঘিরে, সারা দেহের ধারে ধারে কিসের একটা যেন ছায়া ফুটে উঠেছে। তার হাসি, কথা-বার্ত্তা ও চলা-ফেরায় একটা বিষাদ মাখিয়ে গেছে। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠ্লুম। আমার মনে কর্ত্তব্য বুদ্ধিটা সহসা প্রবল হয়ে দেখা দিলে; আমায় মৃদু ভর্ৎসনাও করলে। বল্লুম "মণি, এবার আর তোমার কোন আপত্তিই শুনব না। চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।"

সে কথাটাকে অতি সহজ ভাবে নিয়ে বল্লে—"বেশ ত কালই চল।"

"বেশ।"

অবিলম্বে যাবার সব আয়োজন হতে লাগল। বাড়ীতে কে থাক্‌বে, সঙ্গে কে যাবে; কি কি নিয়ে যেতে হবে, এই নিয়েই দিবসের অনেকটা কেটে গেল। জিনিস পত্রও অনেক বাঁধা, গোছান

শেষ হল। দ্বিপ্রহরে সতীশের একখানি পত্র পেলাম। সে লিখেছে, আমার বাড়ীতে তাদের অতিথি হবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও নানান্ ঝঞ্ঝাটে এবার তা সম্ভব হয়ে উঠ্‌ল না; মণি যেন তাতে, রাগ না করে। তবে তারা একদিন আমার এঘরে আসবেই। আর একটা মজার খবর এই যে, ইন্দু ঘোষ কয়েকদিন পুর্ব্বে বিবাহ করেছে, একটী পরমাসুন্দরী তরুণীকে, তাঁর অভিভাবকের অমতে অতি গোপনে। সতীশ তাতে উপস্থিত ছিল;—দ্বার রক্ষকের দল বৃদ্ধি করবার জন্য। পরিশেষে সে লিখেছে, ইন্দু ঘোষ খুবই সুখী, সতীশের তার সৌভাগ্যকে হিংসা হয়।

পত্রখানি পাঠ করে একটা কথা বার বার মনে হতে লাগল, সতীশের মুখে এ কথাটা সম্পূর্ণ নূতন। রূপ-তৃষ্ণায় তার অন্তরও কি শুষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যেতে বসেছে! সে ত বলেছিল—মানুষের সুখের পথ একটা নয়। সত্য, খুবই সত্য। কিন্তু তাই বলে, যে পথে সে সুখের সন্ধানে গেল না, তাতে না চলার বেদনাটা তাকে আঘাত না করবে কেন? আমার জীবনে ত এমন কোন অস্বাভাবিক কিছু দেখা দিলে না, যা আর সব মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

মঞ্জীও চিঠিখানা পাঠ করে শুধু একটা মন্তব্য প্রকাশ করলে এই বলে যে, সতীশদার এত দুঃখ কেন, বৌদিদির মুখখানি ত ভারি সুন্দর। তার ত খুব ভাল লাগে। তারপর আলোচনাটা চাপা দিয়ে সে স্থানটা ছেড়ে যেতে পারবে বলে তার খুব আনন্দ হচ্ছে, এমনি একটা ভাব নিয়ে সে দিবসের অবশিষ্টটুকুন্ কাটিয়ে দিলে।

রাত্রিতে মঞ্জীর হঠাৎ খুব জ্বর হ'ল। শরীরের তাপ এত যে গায়ে হাত রাখা যায় না! আমার কেমন ভয় হ'ল ;—মঞ্জী কিন্তু দিব্যি অভয় দিয়ে দুঃখ করতে লাগ্‌ল—"যেতে দিলে না দেখ্‌চি।" পরের সারা দিনের ভিতরেও জ্বরের আর উপশম হ'ল না। ডাক্তার এসে ঔষধ দিলেন, কিন্তু অভয় দিতে পারলেন না। ঠিক সন্ধ্যার মুখে, মঞ্জীর মাথার কাছের পশ্চিমের জানালাটা খুলে, চুপ করে দিনের শেষ আলোর রেখাটুকু দেখ্‌চি—মঞ্জী আস্তে আস্তে ডাক্‌লে—"ওগো—"

আমি তার কাছে সরে বসলুম। সে তার তপ্ত মাথাটা আমার কোলের ওপর রেখে দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লে—"আমি মরে গেলে খুব সুন্দরী দেখে আর একটা বিয়ে করবে?—বল?" তার কথাটা শুনে বুকটার ভেতর কে যেন একটা সজোরে ঘা দিলে; পাঁজরাগুলো সুদ্ধ দুলে উঠ্‌ল, হাত পা কেমন যেন কাঁপতে লাগ্‌ল। অসহায়ের মতন তাকে জড়িয়ে ধ'রে বল্লুম—"মঞ্জী! মণি!"

সে বল্লে—"আবার ডাক—।"

"মণি! মণি!" আমার চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বল্লুম—"আমি তোমায় খুব ভালবাসি যে—।"

সে বল্লে—"আরও সরে এস।" আমি তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বল্লুম—"কেন তুমি ওকথা বল্লে? আর বল্‌বে না—বল—?" সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু করুণ হাসি হাসলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে "তোমায় ছেড়ে

যেতে হবেই যে!" তার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল!

"মঞ্জী—মণি—।" আমার তখন খালি মনে হচ্ছিল, আমার অবহেলা, আমারই ঘৃণিত চিত্তের অফুরন্ত কামনারাশি মঞ্জীকে আজ মরণের দ্বারে ঠেলে দিয়েছে। না, আমি এতদিন আমার মন বুঝতে পারি নি; তাকে আমি সত্যিই যে ভালবাসি! এতে রূপের নেশা নেই; আছে শুধু আত্মদানের ব্যাকুলতা! চাইনে, আমি রূপ চাইনে! বিশ্ব নিখিলের বাইরের রূপ সব ধুয়ে মুছে যাক্; শুধু আমার মঞ্জীই থাক। আমার এই ভালবাসাই তাকে মরণ-দূতের সর্ব্বনাশা হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে আসুক! আমি তাকে যে ভালবাসি! তবুও সে বাঁচ্বে না? আমার অবহেলার কি এমন অব্যর্থ ফল?

ডাক্তার এসে আবার নূতন ওষুধ দিয়ে গেলেন। আমি মণির মাথার কাছে চুপ করে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম। মঞ্জীর সংজ্ঞা ধীরে ধীরে লোপ পেল।... ...

রাত তখন গভীর; আঁধার মগনা সুপ্তা বসুধার আঁখি পাতায় তারার আলো লুটিয়ে পড়ছে। মঞ্জীর শিয়রে আমি একলা জেগে বসে আছি। হঠাৎ সে চম্‌কে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লে—"ওগো—!"

"মঞ্জী! মণি—!..."

কিন্তু আর তার সাড়া পেলুম না! সেও চলে গেল!......

সমাপ্ত